মধ্যযুগের ইতিহাস

অধ্যক্ষ হিমাংশুভূষণ সরকার

সূচীপত্র

রোম সাম্রাজ্য

০ ২০০ মাইল

নিউমিডিয়া

কর্সিকা

আরব

মিশর

ভারত

মধ্যযুগের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

বর্ব্বর জাতির আক্রমণ ঃ রোমান সাম্রাজ্যের পতন

গ্রীস ও রোম প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতার আদিম জন্মস্থান। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে বর্ব্বর জার্ম্মান জাতির আক্রমণে এই প্রাচীন সভ্যতার অবসান হয় এবং মধ্যযুগের আরম্ভ হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে মধ্যযুগের আরম্ভ ও অবসান হইয়াছে। মধ্যযুগের এই ইতিহাস পুরাকালের ইতিহাস অপেক্ষা কম বৈচিত্র্যময় নয়।

রোমান সাম্রাজ্যের অবস্থা—এ-যুগের ইতিহাস আলোচনা করিবার আগে বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের কথা কল্পনা করিতে হইবে; পূর্ব্বে ইউফ্রেটিস নদ হইতে আরম্ভ করিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের কূল পর্য্যন্ত ছিল ইহার বিস্তৃতি। ইহার উত্তর সীমায় ছিল কেলটিক্ জাতির বাসভূমি ইংলণ্ড; আর অপর প্রান্তে ছিল ধূ ধূ করা সাহারা মরুভূমির উত্তরপ্রান্ত ও মিশর দেশ। ইহার আয়তন ছিল বিশাল এবং জনবল ও সম্পদ ছিল প্রচুর।

এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজিত ছিল বলিয়া ঐশ্বর্য্য ও সংস্কৃতিতে রোমান সাম্রাজ্য অতুলনীয় গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু সে-সৌভাগ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগেই নানা কারণে রোমের গৌরব ম্লান হইয়া আসিল।

অনেক সময় রোমান সম্রাটের মৃত্যু হইলে সিংহাসন লইয়া তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইত। সেনাপতিগণের সহায়তায় দুর্ব্বল ও অত্যাচারী সম্রাট্গণ সিংহাসন অধিকার করিয়া ক্রমে বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া পড়িতেন। ভাবী সম্রাট্গণের মধ্যে অভিষেক লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ হইলে সেনাপতিদের সম্মুখেও ক্ষমতালাভের পথ প্রশস্ত হইত। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই অনেক সময়ে সম্রাট্দের সিংহাসন দান করিতেন বলিয়া সেনাবাহিনীর ঔদ্ধত্যও অত্যন্ত বাড়িয়া যাইত। খুশীমত অবাধ লুঠতরাজ চালাইতেও তাঁহারা ইতস্ততঃ করিতেন না।

অতীতের রোমান সৈন্যবাহিনী রোমের নাম করিতে গর্ব্ব অনুভব করিত। তাঁহাদের শৃঙ্খলাবোধের তুলনা ছিল না। কিন্তু প্রয়োজন বোধে এ-যুগের রোমানবাহিনীতে বিজাতীয় বর্ব্বরদেরও স্থান দিতে হইয়াছিল। তাহারা আসিয়া রোমানবাহিনীর শৃঙ্খলার ভিত্তি শিথিল করিয়া দিল। রোমের অকর্ম্মণ্য সম্রাট্গণের বিলাস-ব্যসনে রাজকোষ শূন্য হইয়া যাইতেছিল। সাম্রাজ্যের সুদূর সীমান্তের রোমান সেনাপতিমণ্ডলীও কুটিল চক্রান্ত করিয়া সিংহাসন লাভের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধীন রাজার মতই আচরণ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা আর সম্রাটের প্রাপ্য কর নিয়মমত পাঠাইতেন না। অথচ প্রদেশগুলির কর অনিয়মিতভাবে পাওয়ায় রাজকোষের অবস্থা আরও জটিল হইয়া উঠিল। তখন সম্রাট্ প্রজাদের করভার বাড়াইয়া দিলেন। করভারে জর্জ্জরিত প্রজাগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। লুণ্ঠনকারী বিদেশী বর্ব্বরদের অপেক্ষা সরকারী কর আদায়কারিগণকে দেখিলে প্রজারা বেশী ভয় পাইত।

অতীতে গ্রামাঞ্চলের কৃষকগণ স্বাধীনভাবে নিজের জমি চাষ করিত। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তিতে তাহাদের অবস্থা এতই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল যে, জমিজমা বিক্রয় করিয়া তাহারা অনেকে সহরে চলিয়া গেল। যাহারা যাইতে পারিল না, তাহারা অগত্যা বড় জোতদারদের জমি পত্তন লইয়া চাষবাস আরম্ভ করিল। ইহাদের বলা হইত **কলোনাই**। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই কলোনাইদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিল। তখন অনেকেই কৃষিকাজ ছাড়িয়া দিল। ফলে দেশের বহু জমি অনাবাদী পড়িয়া রহিল। ইহার জন্য সম্রাট্ কন্‌ষ্টান্‌টাইনের আমলে এক নূতন নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে, বংশপরম্পরায় কলোনাইদের জমি চাষ করিতেই হইবে। স্বেচ্ছায় তাহারা চাষাবাদ ছাড়িতে পারিবে না। অন্যদিকে সওদাগর, রাজকর্ম্মচারী, শ্রমিক—সকল ক্ষেত্রেই ঐ নিয়ম প্রযোজ্য হয়। ইহাতে কেহই খাটুনির উপযুক্ত মজুরী পাইত না। সেজন্য দেশের সকল স্তরের মানুষের মনেই অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

রোমান সাম্রাজ্যের অগণিত ক্রীতদাস-বাহিনীও চঞ্চল হইয়া উঠিল। দেশে গৃহবিবাদ সুরু হইল। সুবিশাল বোমান সাম্রাজ্যে ঘন ঘন বিদ্রোহ দেখা দিল এবং ক্রমে ক্রমে রোমান সাম্রাজ্য অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িল।

বর্ব্বর জাতির আক্রমণ—এই দুর্ব্বল অন্তঃসারশূন্য সাম্রাজ্যের সীমান্ত ভেদ করিয়া হানা দিল ইউরোপের বর্ব্বর জার্ম্মান জাতিসমূহ ও হূণগণ। এতদিন রাইন ও ডানিয়ুব নদী দিল রোমান সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব সীমানা। তাহার অপর পারেই এই সমস্ত জাতির বাসভূমি ছিল। এই সমস্ত নির্ম্মম রণকুশল জার্ম্মান
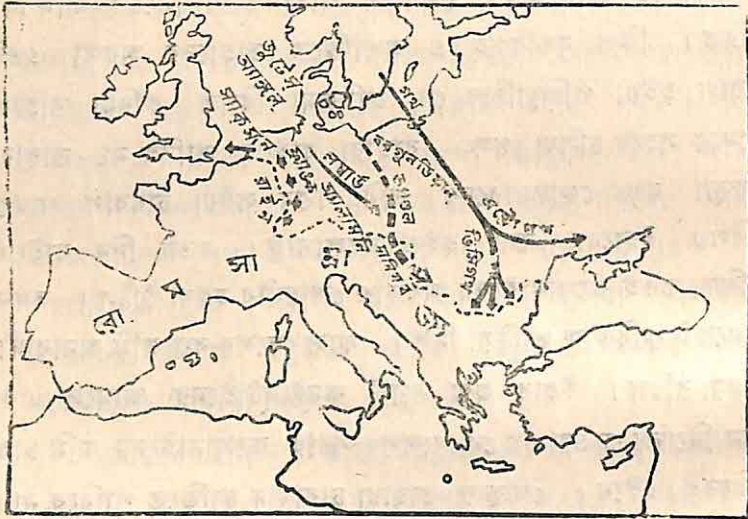
জার্ম্মানগণের অভিযানের ধারা
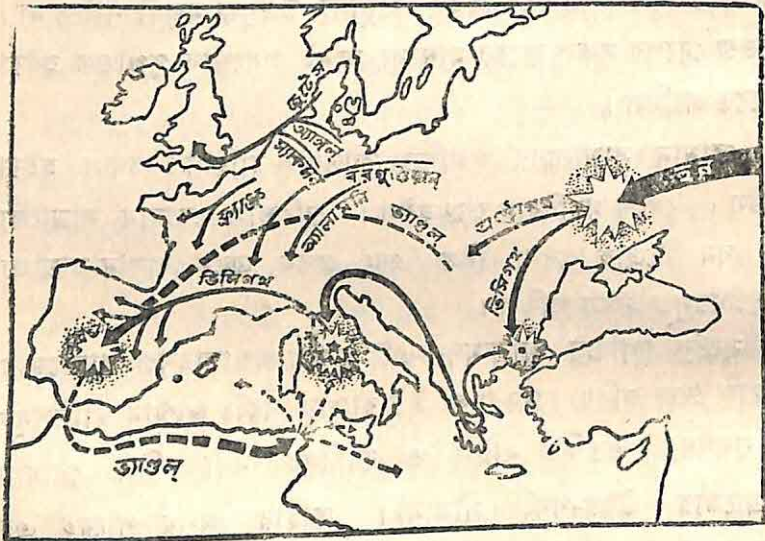
হূণ আক্রমণের ফলে জার্ম্মানদের পলায়নের পথ

অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী বন্যার মত রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তে ও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহাদের গতিরোধের শক্তি সে-যুগের দুর্ব্বল রোমান সম্রাটগণের ছিল না। ইহার পূর্ব্বেই সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য সম্রাট কনষ্টান্‌টাইন কন্‌ষ্টান্‌টিনোপলে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে কালক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিম—এই দুইভাগে রোমান সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া গেল। আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতায় ও রণ-দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মান জাতির আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ একদিন তাসের ঘরের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

জার্ম্মানগণের বিবরণ—আক্রমণকারী জার্ম্মানগণের ভিতর উল্লেখযোগ্য হইল **ফ্র্যাঙ্ক, গথ, ভ্যাণ্ডাল, আলমান, লম্বার্ড, বার্গাণ্ডিয়ান, জুট, স্যাক্সন** ও **এঙ্গেলস্** প্রভৃতি জাতি। গথগণ আবার দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—পূর্ব্বাঞ্চলের **অষ্ট্রোগথ** ও পশ্চিমের **ভিসিগথ**। ফ্রাঙ্কগণ রাইন নদীর তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। ভ্যাণ্ডালদের আক্রমণে হাঙ্গেরী কম্পিত হইয়া উঠিল। কোন কোন জাতি গলে (বর্ত্তমান ফ্রান্সে), স্পেনে, গ্রীসে, এমন কি ইতালীতে পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই সমস্ত জার্ম্মান আক্রমণকারীদের অনেক বিবরণ জুলিয়াস সীজারের "সমালোচনা" (Commentaries) এবং ট্যাসিটাসের "জার্ম্মানী" নামক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। এই পুস্তকগুলি রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। জার্ম্মানগণ দেখিতে ছিল দীর্ঘকায় ও গৌরবর্ণ; মাথায় ছিল রক্তাভ কেশ, চক্ষু ছিল নীলাভ; পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল অনাড়ম্বর। দুঃখ-কষ্ট,

যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং বিপদ-আপদ ছিল তাহাদের নিত্য সহচর। অশ্বারোহণে তাহাদের কৃতিত্ব ছিল অসামান্য। অনেকে ছিল পদাতিক। বর্শা, তীর-ধনুক, তরবারি ও বর্ম্ম ছিল তাহাদের যুদ্ধের প্রধান উপকরণ। তাহারা যে-ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত, তাহা ছিল আর্য্য ভাষারই শাখা বিশেষ।

তখনকার জার্ম্মানী এখনকার মত উর্ব্বর ও শস্যশ্যামল ছিল না। জার্ম্মানগণ অনুর্ব্বর প্রান্তরের মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। তাহাদের উঁচু কাঠের বেড়া-ঘেরা ঘরগুলিকে কুটীর বলিলেই ঠিক হয়—কাঠের ফ্রেমে তৈয়ারী, ঘাস-পাতার ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট কুটীর। গহন অরণ্য পরিষ্কার করিয়া এইরূপ কতকগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট কুটীর নির্ম্মাণ করিলে তাহা হইত এক একটি গ্রাম। এইরূপ বহু গ্রাম লইয়া গঠিত হইত কুল বা কৌম।

গ্রামগুলি ও তাহার সংশ্লিষ্ট জমি-জমা লইয়া নগর গঠিত হইত। একশতটি নগর মিলিয়া একটি বড় অঞ্চল গঠিত হইত। তাহার নাম ছিল **হানড্রেড**। এক একটি কুলের সীমানার মধ্যে কয়েকটি করিয়া হানড্রেড থাকিত। জার্ম্মানদের জীবিকা ছিল শিকার, মাছধরা ও পশুপালন। কৃষকগণ বলদ-চালিত লাঙ্গলে জমি চষিত। খাদ্যশস্যের সহিত আপেল ফলও প্রচুর উৎপন্ন হইত। জার্ম্মানদের সামাজিক গঠন ছিল বর্ব্বর স্তরের। ছোট-বড় প্রতিটি কুলের একজন প্রধান থাকিতেন। দাস ব্যতীত কুলের অন্য সকলে মিলিয়া সেই কুলের প্রধান নির্ব্বাচন করিত। কালক্রমে কতকগুলি কুল মিলিয়া এক একটি রাজ্য গঠিত হয়। ঐ রাজ্যের রাজপদ বংশপরম্পরাগত ছিল না। কুলের সকলে একত্রিত হইয়া

রাজা নির্ব্বাচন করিত। তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য একটি পরিষদ ছিল। প্রত্যেক কুলেরই নিজস্ব সাধারণ সভাস্থলে পরিষদের বৈঠক বসিত। রাজাকে পরিষদের উপদেশ মানিয়া কাজ করিতে হইত। জার্ম্মানদের সমাজ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথমতঃ ছিল **অভিজাত** সম্প্রদায়। তাঁহারা স্বকীয় প্রজাদিগকে লইয়া সৈন্যবাহিনী গঠন করিতেন। তাছাড়া ছিল **স্বাধীন নাগরিক** ও **দাস**। দাসদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না।

রথ প্রতিযোগিতা, মদ্য পান ও জুয়া খেলায় জার্ম্মানদের গভীর আসক্তি ছিল। জুয়া খেলায় তাহারা এত উন্মত্ত হইয়া উঠিত যে, অনেক সময় তাহারা সমস্ত সম্পত্তিই হারাইয়া বসিত। নিজের স্বাধীনতা পর্যান্ত বাজী রাখিয়া তাহারা জুয়া খেলিতে ইতস্ততঃ করিত না। জার্ম্মান স্ত্রীলোকেরাও খুব সাহসী ছিল এবং সমাজে তাহাদের স্থান ছিল খুব উচ্চে। জার্ম্মানজাতি ছিল উদারপ্রাণ ও মৃত্যুভয়হীন। অতিথিপরায়ণ, সত্যবাদী এবং স্বাধীনতার পূজারী জার্ম্মানগণের মধ্যে তখনও রোমান নাগরিক জীবনের পাপ প্রবেশ করিতে পারে নাই।

কালক্রমে উত্তর জার্ম্মানীর নিদারুণ শীত, খাদ্যাভাব, শত্রুর আক্রমণ ও লোকবৃদ্ধির জন্য তাহারা দলে দলে স্বদেশ ছাড়িয়া দক্ষিণের দিকে রওনা হইল। পূর্ব্ব হইতেই রোমান সাম্রাজ্যের উর্ব্বর ভূমি, ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। এখন তাহারা দলে দলে রোমান সাম্রাজ্যের দিকে রওনা হইল; সঙ্গে চলিল স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, জিনিষপত্র, গাড়ী-ঘোড়া এবং গরুর পাল— গ্রামকে গ্রাম যেন তাহাদের সহিত চলিল। এই ভ্রাম্যমাণ দলের

অনেকে শান্তির আশায় রোমান সাম্রাজ্যে স্থায়ী বসতি স্থাপন করিল। কেহ বা রোমান সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ, কেহ বা সম্রাটের দেহরক্ষী হইল।

জার্ম্মানগণের দেশত্যাগ

হুণগণের বিবরণ—জার্ম্মানগণ যখন এই ভাবে রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতেছিল, তখন মধ্য-এশিয়ার অন্য এক যাযাবর দল তাহাদের নূতন বাসভূমি আক্রমণ করে। মধ্য-এশিয়ার এই যাযাবর দল হইল মঙ্গোলীয় হুণ। তাহারা দেখিতে ছিল খর্ব্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণচক্ষু। তাহাদের নাসিকার অগ্রভাগ ছিল ঈষৎ ওল্টানো ও মাথার চুল ছিল খাড়া-খাড়া। সে অতি ভয়াবহ আকৃতি। অশ্বপৃষ্ঠেই তাহাদের জীবন কাটিত। কথিত আছে, আহারের সময়েও তাহারা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিত না। অশ্বারোহণে তাহাদের মুহূর্ত্তের ক্লান্তিও দেখা দিত না। অশ্বগুলিও ছিল সেই দুর্দ্ধর্ষ সওয়ারদেরই উপযুক্ত। খর্ব্বকায় টাট্টু ঘোড়াগুলি অক্লান্ত গতিতে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত।

উট, গরু, ভেড়া, স্ত্রী-পুত্র লইয়া সদলবলে হূণগণ দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া যাইত। ঘূর্ণিবাত্যার মত যে-দেশের ভিতর দিয়া তাহারা যাইত, সেখানে রাখিয়া যাইত মৃত্যু ও মহামারীর বিভীষিকা। তাহাদের কষ্টসহিষ্ণুতা ছিল যেমন অসাধারণ, বর্ব্বরতাও ছিল তেমন তুলনাবিহীন। গল্পে আছে যে, তাহারা চলার পথে অশ্বখুরতলে নারী ও শিশুর দেহ দলিত মথিত করিয়া যাইত। নরমাংসেও তাহাদের অরুচি ছিল না। ছোট ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া বিরাট ঢাল হাতে করিয়া সাক্ষাৎ যমের ন্যায় হূণগণ যখন গথদের বাসভূমিতে নামিয়া আসিল, অসমসাহসী গথগণও সে হূণ-অভিযানের সম্মুখে প্রাণভয়ে পলাইতে আরম্ভ করিল। পলায়ন পথে ডানিয়ুব নদীর তীরে আসিয়া তাহাদের গতি রুদ্ধ হইল। তীরের অপর পারে রোমান সম্রাটদের সুরক্ষিত সীমান্ত। ভিসিগথগণ তখন রোমান সম্রাটের দরবারে দূত
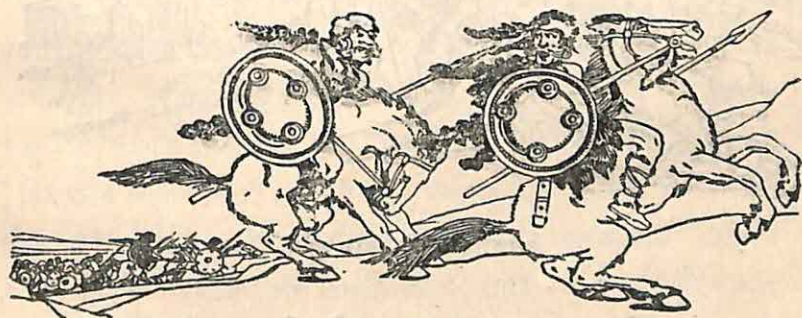
সাক্ষাৎ যমের ন্যায় অশ্বারোহী হূণ

পাঠাইয়া অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আশ্রয় ভিক্ষার আবেদন জানাইল; আর সেই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিল যে, তাহারা আর কখনও রোমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না। রোমান সম্রাট সেই আবেদন মঞ্জুর

করিলে সহস্র সহস্র গথ শরণার্থী রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্ত ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু পরের যুগে রোমান সম্রাটের কর্ম্মচারীদের অকর্ম্মণ্যতায় ও অত্যাচারের ফলে ভিসিগথগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল।

এই বিদ্রোহী ভিসিগথগণের উপযুক্ত নেতা ছিলেন **আলারিক**। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। গথবাহিনী রোমের দ্বারে উপনীত হইলে রোমানগণের দূত অধীনতা স্বীকার করিবার জন্য আলারিকের দরবারে আসে।

আলারিক-এর রোম লুণ্ঠন

রোমানগণ জানিতে চাহে, গথদের দাবী কি। আলারিক বলেন, "তোমাদের যত কিছু সোনা, রূপা, হীরা, জহরৎ ও দাস-দাসী আছে, সমস্তই আমাদের তাঁবুতে পাঠাইয়া দিতে হইবে।" ভীত রোমানগণ প্রশ্ন করে, "তাহা হইলে আমাদের আর কি রহিল?" ঘৃণাভরে আল্যরিক উত্তর দেন, "কেন তোমাদের প্রাণ।" তাহার পর ছয় দিন

ধরিয়া আলারিকের বাহিনী রোমের প্রতিটি রাজপথ ও ঘরবাড়ি লুণ্ঠন করিল। নররক্তের স্রোতে রাজধানী ভাসিয়া গেল ; রোম শ্মশানে পরিণত হইল।

সেই বৎসরই ইতালীতে আলারিকের মৃত্যু হয়। আলারিকের আকস্মিক মৃত্যুর পর ভিসিগথগণ দক্ষিণ গল ও উত্তর স্পেনকে কেন্দ্র করিয়া এক নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিল। জার্ম্মানদের আর একটি শাখা ভ্যাণ্ডালগণ স্পেন অতিক্রম করিয়া আফ্রিকায় চলিয়া গেল। সেখানে কার্থেজের ধ্বংসাবশেষের উপর তাহারা নূতন একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। ভিসিগথরা যখন ইতালীতে প্রবেশ করিতেছিল, তখন পূর্ব্বপ্রান্তের রোমান সাম্রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করিবার সাহস তাহাদের হয় নাই। ইহার কিছুদিন পরে বর্ত্তমান হাঙ্গেরী ও ট্রান্সিলভানিয়া জুড়িয়া হুণরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হুণ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন এক কদাকার হিংস্রপ্রকৃতি নরপশু এ্যাটিলা। তিনি ছিলেন কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বকায় ও প্রশস্তবক্ষ। তাঁহার মাথা ছিল দেহের তুলনায় অনেক বড়। নাক ছিল থ্যাবড়া ও চক্ষু কোটরগত। তদানীন্তন লেখকগণ তাঁহার নাম দিয়াছেন "বিধাতার অভিশাপ।" তিনি মাত্র দশ বৎসরের মধ্যেই কাস্পিয়ান তীর হইতে রাইন নদী পর্য্যন্ত এক বিশাল হুণসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তথা হইতে তিনি একই সময়ে রোম ও কন্‌ষ্টান্‌টিনোপল আক্রমণের ভয় দেখাইতেন। কন্‌ষ্টান্‌টিনোপলের রোমান সম্রাট্ প্রচুর ধন সম্পদ দিয়া তাঁহাকে বশ করেন। তিনি তখন অতি নগণ্য কারণে পশ্চিম-রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া বসিলেন। সমগ্র গল প্রদেশ ও ইটালী এ্যাটিলার আক্রমণে বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইল। অভিযানের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে

ভিসিগথ
অস্ট্রোগথ
ফ্রাঙ্ক
ভ্যাণ্ডাল
বরগুনডিয়ান
যুগোস্লাভিয়া
ভূমধ্য সাগর
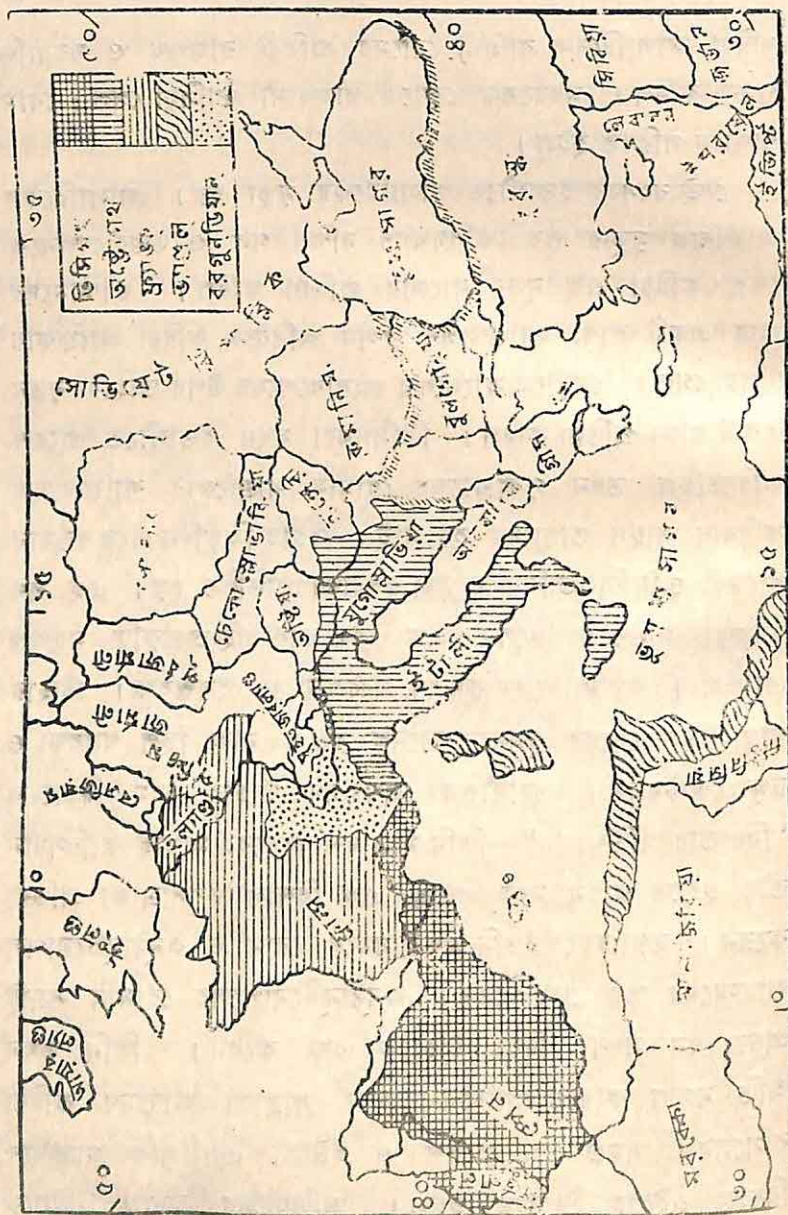
এ্যাটিলার আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং কালক্রমে হূণগণ ইউরোপীয় জনসমুদ্রের সহিত মিশিয়া গিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বিদায় হইল।

হূণ আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইলেও কিছুদিন পরে ভ্যাণ্ডালদের আক্রমণে রোম পুনরায় বিধ্বস্ত হইল। নৌবহর যোগে সহস্র সহস্র ভ্যাণ্ডাল-বাহিনী রোম নগর ছারখার করিয়া সমস্ত ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। ভ্যাণ্ডালগণ এইরূপে কার্থেজকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে স্বীয় শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিল।

বর্ব্বর জাতির আক্রমণের ফলাফল—এই সমস্ত বর্ব্বর জাতির আক্রমণে পশ্চিম-রোমান সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি চিরতরে অস্তমিত হইল। পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসেও নামিয়া আসিল গাঢ় অন্ধকার। এই সাম্রাজ্যের ধ্বংসের উপর কয়েকটি নূতন জাতি ও রাজ্যের উদ্ভব হইল। গথগণ স্পেনে আধিপত্য বিস্তার করিল; ফ্রাঙ্কগণ করিল ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে। অন্যান্য বহু রাজ্যও গড়িয়া উঠিল। জার্ম্মান জাতির এই আক্রমণের ফলে রোমান সভ্যতা এবং ইউরোপের রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইল।

সমসাময়িক ভারতবর্ষ

ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্যের আধিপত্যের শেষযুগে ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতেরও রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় ভারতের সেই ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশে পুনরায় শান্তি ও সমৃদ্ধি দেখা দিল। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সুবর্ণযুগ আরম্ভ হইল। দেশের এই আভ্যন্তরীণ শান্তি রূপায়িত হইল অপরূপ শিল্পে,

সাহিত্যে, কাব্যে, ভাস্কর্য্যে এবং সঙ্গীতে। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক্ অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না ; আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা ও বৈদেশিক আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। যে হূণেরা ইউরোপ আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদের স্বজাতি **শ্বেত হূণগণ** হিংস্রবিক্রমে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করিল। তখন এ্যাটিলা ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্য ছারখার করিতেছিলেন। একদা গুপ্ত সম্রাট্ স্কন্দগুপ্ত এই হূণ আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হূণগণ দুর্ব্বার গতিতে ভারতে প্রবেশ করিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব-রবিও অস্তাচলগামী হইল।

তোরমান ও মিহিরকুল—পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে হূণ দলপতি **তোরমান** গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি বিস্তৃত অঞ্চল দখল করিয়া বসিলেন। পঞ্জাব হইতে মালব পর্য্যন্ত ভূভাগে হূণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। হূণরাজ তোরমান অসভ্য বর্ব্বর ছিলেন
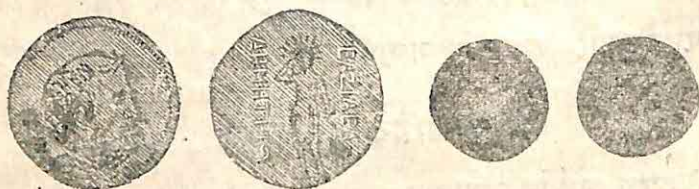
বৃষ-অঙ্কিত তোরমান ও মিহিরকুলের মুদ্রা

বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্র **মিহিরকুলের** (বা মিহিরগুল) হিংস্র বর্ব্বরতার তুলনা ছিল না। তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ শয়তানের প্রতিমূর্ত্তি। কহ্লণ পণ্ডিত তাঁহার "রাজতরঙ্গিণী" নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে বলিয়াছেন যে, মিহিরকুল পর্ব্বতের শিখর হইতে নীচে

হস্তী নিক্ষেপ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মবিদ্বেষী। বহু বৌদ্ধমঠ তাঁহার কোপানলে বিনষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল **শাকল** বা বর্ত্তমান **শিয়ালকোটে**। মিহিরকুলের নৃশংসতায় ও অত্যাচারে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। দেশবাসী অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য দশপুরাধিপতি (মালব) যশোধর্ম্মণের পতাকাতলে সমবেত হইল। গুপ্তবংশীয় রাজা বালাদিত্যের সহায়তা লইয়া তিনি বিপুল বিক্রমে হুণদিগকে আক্রমণ করিলেন। মিহিরকুল পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। কিন্তু পরাজিত শত্রুর প্রতি মমতা বশতঃ বালাদিত্য তাঁহাকে প্রাণদান করিয়া রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন। মিহিরকুল তখন কাশ্মীরে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে কৃতজ্ঞতার স্থান ছিল না। যে বালাদিত্য তাঁহাকে জীবন ভিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি প্রথম সুযোগেই তাঁহাকে পুনরাক্রমণ করিলেন। কিন্তু মিহিরকুলের এই অভিযান আর সফল হইল না। দশপুর বা মান্দাসারের অধিপতি যশোধর্ম্মণ হুণরাজ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া অক্ষয় খ্যাতি লাভ করিলেন।

হুণ আধিপত্যের অবসান—মিহিরকুলের পরাজয়ের পর হইতেই ভারতের হুণশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হুণ দলপতি উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও মালবে আরও কিছুকাল রাজত্ব করিলেও তাহাদের পূর্ব্ব আধিপত্য আর ফিরিয়া আসিল না। কালক্রমে তাহারা ইউরোপের হুণদের মতই ভারতীয় জনসমুদ্রে মিলাইয়া গেল। হুণদের প্রায় সকলেই ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিল। কেহ কেহ বলেন, রাজপুতগণ হুণদেরই বংশধর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাইজানটাইন সাম্রাজ্য ও সভ্যতা

পূর্ব্ব-রোমান সাম্রাজ্য—জার্ম্মান আক্রমণকারীদের হাত হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে গিয়া যে রোমান সাম্রাজ্য তুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহার কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দের পর সেই তুই-ভাগে বিভক্ত রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ বর্ব্বর আক্রমণকারিগণের কবলিত হইল। পশ্চিমাঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্য বলিতে কোন কিছুরই আর অস্তিত্ব রহিল না। কিন্তু পূর্ব্ব-রোমান সাম্রাজ্য তখনও সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বল্কান উপদ্বীপ, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, ইজিপ্ট প্রভৃতি জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলে পূর্ব-রোমান সম্রাটের কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সাম্রাজ্যের মর্ম্মস্থল ও শাসনকেন্দ্র ছিল **কন্‌ষ্টান্‌টিনোপল**। গ্রীক্ যুগে ইহার নাম ছিল **বাইজানটিয়াম্**। বর্ত্তমানে ইহা তুরস্কের অন্তর্গত **ইস্তাম্বুল** নগর। ইহার প্রতিষ্ঠাতা রোমান সম্রাট্ কন্‌ষ্টান্‌টাইনের নাম অনুযায়ী এই প্রসিদ্ধ নগরটির নাম হইয়াছিল কন্‌ষ্টান্‌টিনোপল।

সম্রাট্ জাষ্টিনিয়ান—এক হাজার বৎসরেরও অধিককাল প্রাচ্যে রোমান সম্রাট্‌গণের রাজত্ব অব্যাহত গতিতে চলিয়াছিল। তবে নামে রোমান সাম্রাজ্য হইলেও এই দীর্ঘ সহস্র বৎসরের ভিতর গ্রীক, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি বহু বিভিন্ন জাতির সম্রাট্ ইহার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের মধ্যে যে নামটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, তাহা হইল সম্রাট্ প্রথম **জাষ্টিনিয়ানের**।

তিনি প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। ম্যাসিডোনিয়ার এক কৃষক পরিবারে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি রোমের প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায়ক হইলেন সম্রাজ্ঞী **থিওডোরা** ও সেনাপতি **বেলিসারিয়াস**। সম্রাজ্ঞী প্রথম জীবনে অভিনেত্রী ছিলেন। সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী উভয়েরই চরিত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা-প্রিয়তা, দৃঢ় সঙ্কল্প ও প্রগাঢ় রাজনৈতিক জ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ গুণের বিকাশ হইয়াছিল। সম্রাট্ তাঁহার সকল ক্ষমতা একটি অখণ্ড গোঁড়া খৃষ্টান রোমান সাম্রাজ্য গড়িবার চেষ্টায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সারা জীবনের সাধনার এই স্বপ্ন অনেকাংশে সফলও হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকাল যুদ্ধবিগ্রহে অতিবাহিত হইলেও সম্রাট্ ছিলেন সাহিত্য, ধর্ম ও স্থাপত্যশিল্পের প্রগাঢ় অনুরাগী। তাঁহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। বহু বিনিদ্র রজনী তিনি রাজকার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। তখন তাঁহাকে হঠাৎ কেহ দেখিলে মনে করিত—তাঁহার বোধ হয় নিদ্রার প্রয়োজন নাই। সেইজন্য বিভ্রান্ত জনসাধারণ তাঁহাকে নিশাচর প্রেতাত্মা বলিয়া মনে করিত।

সম্রাট্ জাষ্টিনিয়ান

সম্রাটের বিজয় অভিযান—সম্রাট্ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই (৫২৭ খৃঃ) পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বহু বৎসর ব্যাপী পারস্যের সহিত নিরর্থক সংগ্রাম চলিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বের শেষ দিকে এই অর্থহীন রক্তক্ষয়কারী সংগ্রামের সাময়িক বিরতি ঘটিয়াছিল। পারসিক যুদ্ধের সাময়িক বিরতির সুযোগ লইয়া সেনাপতি বেলিসারিয়াস জলপথে উত্তর আফ্রিকা জয় করিয়া পুনরায় তথায় রোমানদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিলেন। তাহার পর তিনি সিসিলি, দক্ষিণ ইটালী ও রোম বিজয় করিয়া ইটালীর অষ্ট্রোগথ নরপতিকে বন্দী করিলেন। পরবর্ত্তী সেনাপতি ইটালী বিজয় সমাপ্ত করিয়া ইহাকেও পূর্ব্ব-রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই দক্ষিণ স্পেনেও রোমান আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপে এককালের দ্বিধাবিভক্ত রোমান সাম্রাজ্য সম্রাট্ জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হইল। কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বল উত্তরাধিকারিগণের পক্ষে এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই।

সম্রাজ্ঞী থিওডোরা

জাষ্টিনিয়ান সংহিতা—আইন সংস্কারের জন্য সম্রাট্ জাষ্টিনিয়ান ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি

দশজন পণ্ডিত প্রতিনিধির একটি বিচার পরিষদ গঠন করিয়া দেন। পূর্ব্ববর্ত্তী রোমান সম্রাট্‌গণের রচিত আইনের সারাংশের সহিত প্রচলিত বিধানের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দীর্ঘকালের অক্লান্ত চেষ্টায় সম্রাট্ জাষ্টিনিয়ানের এই আইনশাস্ত্রটি সঙ্কলিত হয়। ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে "**জাষ্টিনিয়ান সংহিতা**"। এই সংহিতার প্রভাব ছিল সারা বিশ্বব্যাপী। আজিও ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্র জাষ্টিনিয়ান প্রবর্ত্তিত রোমান আইন কম-বেশী অনুসরণ করিয়া থাকে। পৃথিবীর নানাদেশে ইউরোপীয় জাতিসমূহ যখন উপনিবেশ গড়িতে সুরু করিল, তখন দক্ষিণ আমেরিকা, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল এবং ফিলিপাইনে এই আইন তত্রত্য দেশের আইনে অনুপ্রবেশ করিল। বস্তুতঃ বর্ত্তমান জগতে এখনও সেই আইনের রাজত্ব চলিতেছে।

সাম্রাজ্যের জীবনধারা—এই বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য যথোপযুক্ত সামরিক ব্যবস্থাও ছিল। সম্রাটেরা তখন এশিয়া মাইনর ও আর্ম্মেনিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতেন। তাঁহাদের নৌবহরের প্রধান অস্ত্র ছিল **গ্রীক আগুন**। ইহা হাত বোমার মত নিক্ষেপ করিলে শত্রুর নৌকায় লাগিয়া বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটাইত। ইহার আবিষ্কারক ছিলেন একজন সিরিয়াবাসী। একবার পারসিক সৈন্যগণ রাজধানী বেষ্টন করিয়া ফেলিলে রোমান সৈন্যগণ এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অবরোধ ভঙ্গ করিয়াছিল। অনেক সময় পাত্র বোঝাই মারাত্মক রাসায়নিক দ্রব্যও যন্ত্র সাহায্যে শত্রুর উপর নিক্ষেপ করা হইত।

এই মদগর্ব্বী বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের কর্ম্মস্থল ছিল ইহার রাজধানী। মর্ম্মরা ও কৃষ্ণসাগরের সঙ্গমস্থলে, যেখানে এশিয়া আসিয়া

ইউরোপের সহিত মিশিয়াছে, সেইখানে সাতটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ছিল এই সাম্রাজ্যের রমণীয় রাজধানী কন্‌ষ্টান্‌টিনোপল। পাহাড় ও সমুদ্রের বাহুবন্ধনে নগরটি স্বভাবতঃই সুরক্ষিত ছিল; তাহার উপর একশত ফুট উচ্চ প্রাচীর তুলিয়া ইহাকে আরও দুর্ভেদ্য করা হইয়াছিল।

কন্‌ষ্টান্‌টিনোপলে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের গভীর অনুশীলন হইত। পশ্চিম-রোমান সাম্রাজ্য বর্ব্বর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইলে এখানকার পণ্ডিতগণই গ্রীক সভ্যতা ও সাহিত্যকে রক্ষা করেন। এখান হইতে গ্রীক বা গোঁড়া খৃষ্টধর্ম্ম পূর্ব্ব ইউরোপে, বিশেষতঃ রুশিয়ায় প্রচারিত হয়। সম্রাটের দরবারে ঐশ্বর্য্যের সমারোহ আমাদিগকে আরব্যোপন্যাসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। লোকে সোনার গাছে মণিমুক্তা খচিত ফুল ও সোনার পাখী দেখিত; দরবারে জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক, যন্ত্রচালিত ঘড়ি, খেলনা ও অসংখ্য রাজকর্ম্মচারী দেখিয়া তাহারা অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিত।

রাজধানী কন্‌ষ্টান্‌টিনোপলের মনোরম সেতু, সাধারণ স্নানাগার, দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, পার্ক, লাইব্রেরী, যাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, থিয়েটার এবং বহুবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান উহার গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। সর্ব্বোপরি ছিল সম্রাট্ জাষ্টিনিয়ান নির্ম্মিত **সেণ্ট্ সোফিয়া গীর্জ্জা**। বাইজানটিয়ামের একজন কবি ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ধরাতলে স্বর্গের একটি টুক্‌রা যেন খসিয়া পড়িয়াছে।" গীর্জ্জার ভিতরকার রঙ্-বেরঙের মার্ব্বেল পাথর, মসৃণ মার্ব্বেলের স্তম্ভ, লাল ও সোনালী রঙ্-এর কাঁচের মোজাইক-এর কারুকার্য্য ভক্তের চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দিত। এখানকার মোজাইক এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও এনামেলের কারুকার্য্য ছিল অতুলনীয়।

কনষ্টান্‌টিনোপলের পতন হইলে বিজয়ী অটোম্যানগণ এই অতুলনীয় গীর্জ্জাটিকে মসজিদে পরিণত করে। এখানে যে-ছবিটি দেখিতেছ, তাহা হইল মসজিদে রূপান্তরিত গীর্জ্জার চিত্র। ভূমধ্যসাগরে বহু
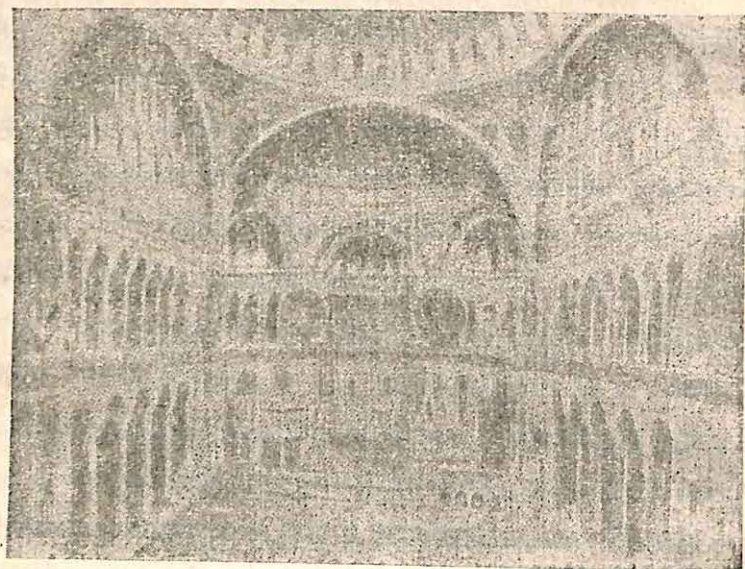
সেণ্ট সোফিয়া গীর্জ্জা

দেশ ছাড়াও ইথিওপিয়া, সিংহল, ভারতবর্ষ, চীন ও রুশিয়া দেশের সহিত এই নগরের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।

সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকালে তুইজন সাধু চীন দেশ হইতে রেশম পোকার ডিম ফাঁকা বাঁশের ভিতর পূরিয়া লইয়া আসেন। তখন হইতে রোমান সাম্রাজ্যে রেশম উৎপাদন আরম্ভ হয়।

রোমের অনুকরণে কনষ্টান্‌টিনোপলের নাগরিকদের আমোদ-প্রমোদের জন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর ঘিরিয়া ক্রীড়াক্ষেত্র রচিত হইয়াছিল।

তথায় বিজয়যাত্রা দেখিতে আসিয়া জনতা বিজয়ী সেনাপতিদের নিকট হইতে লুণ্ঠনের প্রসাদ পাইত। রথ প্রতিযোগিতা দেখিবার জন্য উত্তেজিত জনতার ভিড়ে ক্রীড়াক্ষেত্র যেন ফাটিয়া পড়িত। এখানেই প্রথম জীবনে সম্রাজ্ঞী থিয়োডোরা জনতার সম্মুখে তাঁহার অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন। একটি বিখ্যাত সার্কাসদলের

সভাসদগণসহ সম্রাট জাষ্টিনিয়ান

একটি একচক্ষু-বিশিষ্ট কুকুর ছিল। দর্শকগণের নিকট হইতে সংগৃহীত স্তূপীকৃত আংটির মধ্য হইতে একটি একটি করিয়া আংটি বাছিয়া সে নির্ভুলভাবে অধিকারীর নিকট ফিরাইয়া দিয়া আসিতে পারিত।

তবে রথ প্রতিযোগিতাতেই সৃষ্টি হইত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তেজনা। দর্শকগণ প্রতিযোগী রথগুলির বর্ণ অনুযায়ী **সবুজ ও নীল**—এই দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়িত। প্রতিযোগিতার সময়

সমর্থকগণ উত্তেজনায় আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। একবার উত্তেজনার মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া গিয়া ব্যাপক দাঙ্গায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রায় ত্রিশ সহস্র লোককে সেজন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যের অবসান—অবশেষে একদিন এই বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের দীর্ঘ ইতিহাসের উপর যবনিকা পড়িল। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পারসিক, আরব ও তুর্কীগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া সাম্রাজ্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তদুপরি আভ্যন্তরীণ অশান্তি, ক্রমাগত সম্রাট পরিবর্ত্তন এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মযুদ্ধ ইহার ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া দিল। এই দুর্ব্বল সাম্রাজ্য দুর্দ্ধর্ষ আটাম্যান তুর্কীগণকে আর প্রতিহত করিতে পারিল না। অবশেষে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে অটোম্যান তুর্কীদের আক্রমণে কন্‌ষ্টান্‌টিনোপলের পতন হইল।

কন্‌ষ্টান্‌টিনোপলের পতনের পর এক মহান্ সভ্যতার অবসান হইল। সে-সভ্যতার ভিত্তি ছিল প্রাচ্য, গ্রীক ও রোমান সভ্যতার শ্রেষ্ঠ গুণাবলী। এতকাল বাইজানটাইন সাম্রাজ্য পশ্চিম ইউরোপকে মুশ্লিম আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিয়া সে-দেশে বর্ব্বর জাতিদের মধ্যে সভ্যতার আলো বিস্তার করিতে সাহায্য করিয়াছিল। এবার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে মুশ্লিম অভিযানের পথের সকল বাধাই দূর হইয়া গেল।

তৃতীয় অধ্যায়

সম্রাট শ্রীহর্ষ : হিউয়েনসাঙের ভ্রমণ কাহিনী : সমসাময়িক চীনদেশ

শ্রীহর্ষের সাম্রাজ্য ও রাজধানী—গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষভাগে উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্যের সামন্ত প্রভু স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল গৌড়, কনৌজ, থানেশ্বর ও মালব। থানেশ্বররাজ বৈবাহিক সূত্রে কনৌজের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের পিতা ছিলেন থানেশ্বরের অধীশ্বর। গৌড়রাজ শশাঙ্ক থানেশ্বর রাজগণের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় একশত বৎসর পরে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সময় (৬০৬—৬৪৭ খৃষ্টাব্দে) উত্তর ভারতে আর একটি ঐক্যবদ্ধ বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ করিয়া তিনি এই সাম্রাজ্যটিকে বহু বিস্তৃত করেন। পূর্ব্ব-পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চল তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সম্রাট্ শ্রীহর্ষের রাজধানী ছিল কনৌজে। গঙ্গার পূর্ব্বতীরে এই সহরটিকে সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত করিবার জন্য প্রচুর আয়োজন করা হইয়াছিল। বহু ধনী ও ব্যবসায়ী-অধ্যুষিত রাজধানীটি ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে ঝল্‌মল্ করিত। সুউচ্চ হর্ম্ম্যমালা, মনোহর উদ্যান ও স্বচ্ছ সরোবর ইহাকে অপূর্ব্ব শ্রী প্রদান করিয়াছিল। লোকের সমৃদ্ধি এবং তাহাদের রেশমের পোষাক-পরিচ্ছদ বিদেশী পর্য্যটকদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। বিভিন্ন দেশের দুর্লভ দ্রব্যের একটি সংগ্রহশালা ছিল রাজধানীর অন্যতম বিশেষত্ব।

শ্রীহর্ষ, রাজ্যশ্রী এবং শশাঙ্কের কথা—মহারাজ শ্রীহর্ষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল রাজ্যবর্দ্ধন, ভগ্নী ছিলেন রাজ্যশ্রী। কনৌজের মৌখরীরাজ গ্রহবর্ম্মার সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হয়। কিন্তু রাজকুমারীর জীবন সুখের হইল না। গৌড়রাজ শশাঙ্ক এবং মালব দেশের রাজা দেবদত্ত একত্রিত হইয়া যুদ্ধে গ্রহবর্ম্মাকে নিহত করিলেন; রাজ্যশ্রী বন্দিনী হইলেন। তখন থানেশ্বরের রাজা ছিলেন রাজ্যবর্দ্ধন। তিনি প্রিয় ভগ্নীকে উদ্ধার করিতে আসিয়া শশাঙ্কের হস্তে নিহত হন। এইরূপে সিংহাসনশূন্য কনৌজ ও থানেশ্বর রাজ্যের গুরুভার শ্রীহর্ষের স্কন্ধে অর্পিত হইল। সম্রাট্ শ্রীহর্ষ তখন সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। সিংহাসন লাভের পর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি ভগ্নীকে উদ্ধারের নিমিত্ত অভিযানে বাহির হইলেন।
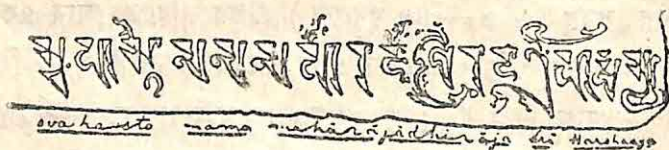
সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের স্বাক্ষর

ইতিমধ্যে বন্দিনী রাজ্যশ্রী জনৈক অমাত্যের সহায়তায় কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। পথে বিন্ধ্যারণ্যে আসিয়া তিনি ক্ষোভে, দুঃখে ও অপমানে আত্মবিসর্জ্জন দিবার সঙ্কল্প করেন। তদুদ্দেশ্যে তিনি সহচরীদের দ্বারা চিতা সাজাইয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় সম্রাট্ শ্রীহর্ষ আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। তদবধি ভ্রাতা ও ভগিনী আজীবন একত্রিত হইয়া থানেশ্বর ও কনৌজ

রাজ্য ছুইটির শাসনকার্য্য চালাইতেন। ইহার পর দীর্ঘকাল সম্রাট্ শ্রীহর্ষ ও গৌড়রাজ শশাঙ্কের সহিত সংগ্রাম চলিয়াছিল। কিন্তু জীবিতকালে শশাঙ্ক শ্রীহর্ষের নিকট কখনই পরাজয় বরণ করেন নাই। 'কাদম্বরী' লেখক মহাকবি বাণভট্ট শ্রীহর্ষের জীবনের অনেক ঘটনা হর্ষের জীবনচরিতের ভিতর লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।
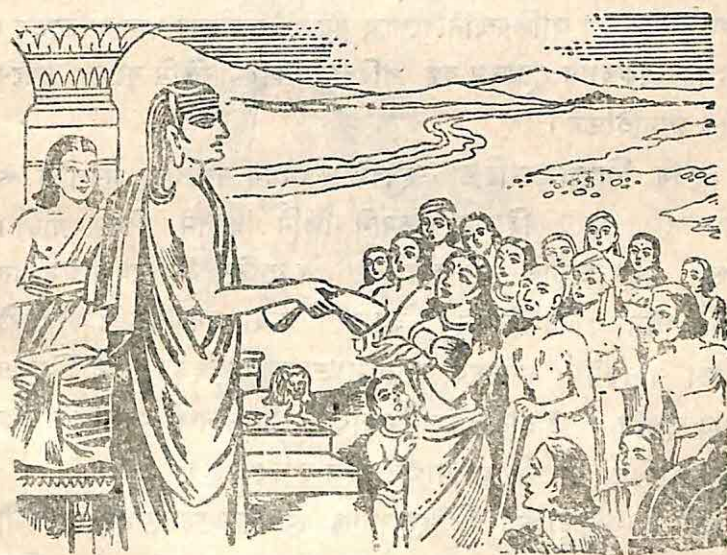
শ্রীহর্ষের দান

শ্রীহর্ষ ও বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীহর্ষ শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্তির জন্য ব্রাহ্মণগণ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি

কনৌজে এক ধর্ম্মসম্মেলন আহ্বান করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। একটি মন্দিরে স্বর্ণনির্ম্মিত বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। শাক্য মুনির সেই প্রতিমূর্ত্তিটি হস্তীর পৃষ্ঠে চড়াইয়া শোভাযাত্রা সহকারে সম্মেলনে লইয়া যাওয়া হইত। কনৌজের উৎসব-শেষে সম্রাট্ হিউয়েনসাঙকে লইয়া প্রয়াগে প্রস্থান করিলেন। প্রয়াগে পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর একটি মহোৎসব হইত। সেখানে বুদ্ধ, সূর্য্য ও শিবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া তিনি পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকল প্রজাদের দান করিতেন। অতঃপর একখানি পুরাতন বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি বুদ্ধের চরণে প্রণতি জানাইতেন।

হর্ষের বিদ্যোৎসাহিতা—হর্ষবর্দ্ধন যেমন বিচক্ষণ নরপতি ও শক্তিশালী সম্রাট্ ছিলেন, তেমনি তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। বাণভট্ট, ময়ূর প্রভৃতি বহু কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার রাজসভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে হর্ষচরিত ও কাদম্বরী রচয়িতা বাণভট্টই সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। হর্ষ নিজেও ছিলেন সুকবি। তাঁহার রচিত 'রত্নাবলী', 'নাগানন্দ' প্রভৃতি নাটক তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙ ও তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী—কনৌজের ধর্ম্মসম্মেলন ও প্রয়াগের মহোৎসবের বিবরণ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হিউয়েনসাঙের শৈশবে চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। তাই অতি অল্প বয়সেই তিনি সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত করিয়া আরও জ্ঞান লাভের আশায় পুণ্যভূমি ভারতে আসিবার মনস্থ করেন। তখনকার দিনে চীনের সম্রাটের নির্দ্দেশ ব্যতীত চীন হইতে বাহিরে

যাইবার উপায় ছিল না। হিউয়েনসাঙ তাঁহার এই শুভ কার্য্যের জন্য রাজার অনুমতি চাহিয়া ব্যর্থমনোরথ হন।

অবশেষে রাজধানীর প্রহরীদের চক্ষু এড়াইয়া তিনি একাই সেই দুর্গম অভিযানে প্রবৃত্ত হন। প্রতি সীমান্তে তাঁহাকে গ্রেপ্তারের আদেশ জারী করা হইয়াছিল।

হিউয়েনসাঙ

তিনি কোনক্রমে সীমান্ত পার হইয়া গোবী মরুভূমির পথে অগ্রসর হন। সেখানকার সীমান্ত রক্ষী তাঁহাকে নিরাপদে ভারতে যাইবার আবশ্যকীয় উপদেশ দেন।

তাঁহার নির্দ্দেশে হিউয়েনসাঙ এবার সাধারণের যাত্রাপথ পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন পথে যাত্রা আরম্ভ করেন। মধ্য এশিয়ার এই অঞ্চলগুলিতে তখন বৌদ্ধপ্রভাব প্রবল ছিল। চীনদেশীয় একজন বৌদ্ধ সামন্ত-রাজা তাঁহাকে লোকজন দিয়া সীমান্ত পারের তুর্কী খান-এর রাজদরবারে পৌঁছাইয়া দেন।

খান বিধর্ম্মী হইলেও ধর্ম্মগুরুর যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও আদর আপ্যায়নের চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া অবশেষে হিউয়েনসাঙের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরুদেবকে কাবুল পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। পথে পড়ে **সমরখন্দ**। তখন সমরখন্দ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ও জনবহুল। চমৎকার দীর্ঘকায় ঘোড়া ও সুনিপুণ কারিগরের জন্য বাণিজ্যকেন্দ্রটি বিখ্যাত ছিল। তারপর **বালখ, কাবুল** প্রভৃতি উপত্যকা হইয়া তিনি ভারতে প্রবেশ করিলেন। এতদিনে তাঁহার সাধনার সিদ্ধি হইল।

হিউয়েনসাঙ নেপাল হইতে সিংহল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কোথাও তাঁহার চোখে পড়িয়াছে ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর-নগরী, আবার কোথাও তিনি দেখিয়াছেন জনবহুল সমৃদ্ধ গ্রাম ও সহর। এদেশের লোকের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। লোকের সরলতা, সততা ও সৌজন্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শিক্ষার দিকেও সকলের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে বালক-বালিকাদিগকে সাত বৎসর বয়স হইতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত। ব্যাকরণ, কলা-বিদ্যা, ভেষজ বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র ও দর্শন তাহাদের পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাধারণতঃ ত্রিশ বৎসর বয়সে এই শিক্ষা সমাপ্ত হইত।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তখন ভারতে উচ্চশিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। হর্ষবর্দ্ধন ও অন্যান্য দানশীল ব্যক্তির সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। সেখানে অধ্যাপনার গৃহ, সাধারণ পাঠাগার,
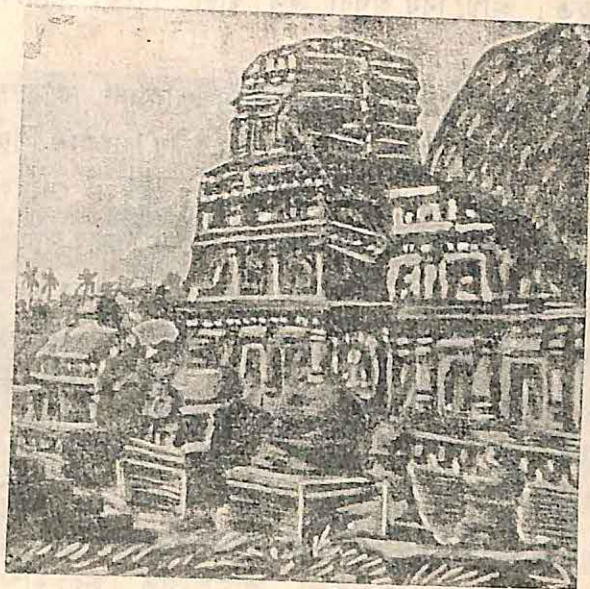
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকদের থাকিবার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকা ছিল। এখানে দশ হাজার ছাত্রকে বিনাব্যয়ে থাকিবার ও পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইত। কঠোর নিয়মের মধ্যে থাকিয়া দীর্ঘকাল অধ্যয়নের পর ছাত্রগণ তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত করিত। প্রাথমিক পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হইত না। বিখ্যাত বাঙ্গালী পণ্ডিত শীলভদ্র তখন নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন।

রাজ্যশাসন প্রণালীর উৎকর্ষ হিউয়েনসাঙ বিশেষ প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। অপরাধিগণের শাস্তি কিন্তু কঠোর ছিল। গুরুতর অপরাধ করিলে দোষীগণের নাসিকা, কর্ণ, হস্ত বা পদ ছেদন করা হইত ; অগ্নি, বিষ অথবা জল দ্বারা পরীক্ষা করিয়া অপরাধ নির্ণয়ের ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল।

হিউয়েনসাঙ ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ **দ্বিতীয় পুলকেশীর** রাজ্যেও গিয়াছিলেন। তিনি পুলকেশীর সামরিক শক্তি ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। পুলকেশী এত দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন যে, স্বয়ং হর্ষবর্দ্ধনও তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। হিউয়েনসাঙ বলিয়াছেন যে, লোকে তাঁহাকে ভয় করিত। সেখানকার লোকদের কঠোর প্রকৃতি এবং হিংসাপরায়ণ চরিত্রও চৈনিক পরিব্রাজকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। দ্বিতীয় পুলকেশী মহারাষ্ট্রে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এক সময় তাঁহার বিজয় বাহিনী নর্ম্মদা তীর হইতে কাবেরীর পরপার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। পুলকেশীর রাজধানী বাদামীর সন্নিকটে অনেকগুলি গুহা-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইগুলিকে হিন্দু দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইয়াছিল।

চালুক্যরাজ্যের দক্ষিণে ছিল পল্লবগণের রাজ্য। রাজধানীর মন্দিরগুলি ছাড়া আরও বহু মন্দির এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে সমুদ্র-সৈকতে **মামল্লপুরম** বা **মহাবলীপুরমে** অবস্থিত মন্দিরগুলি ভুবন-বিখ্যাত। আস্ত পাহাড় কুঁদিয়া এই সমস্ত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাদিগকে সাত প্যাগোডা বা **মামল্লপুরমের রথ** বলে। পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর

নামানুসারে এই রথ বা প্যাগোডাগুলির নাম রাখা হইয়াছে। মন্দিরগাত্রের মূর্ত্তিশিল্প আজিও পল্লবশিল্পীর মরণজয়ী প্রতিভার সাক্ষ্য দিতেছে।

মামল্লপুরমের রথ
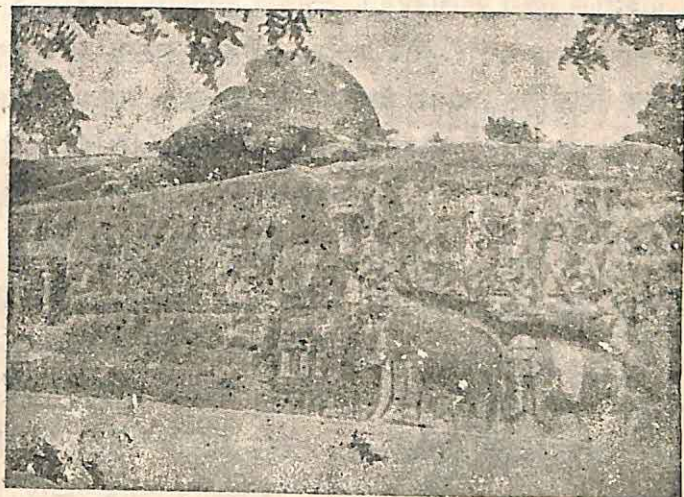
এইরূপে বহুকাল দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়া হিউয়েনসাঙ চীনদেশে ফিরিয়া গেলেন এবং সঙ্গে লইয়া গেলেন অগণিত বৌদ্ধ-শাস্ত্র। অপূর্ব্ব সমারোহের সহিত চীন সম্রাট্ তাই-সুঙ্ তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। সম্রাট্ স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বরণ করেন। তাহার পর যাহাতে আজীবন তিনি ভারতীয় শাস্ত্র অনুবাদ করিতে পারেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা করিয়া দেন।

সমসাময়িক চীন ও তাঙ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

হিউয়েনসাঙ যখন ভারতে আসেন, তখন তাঙ বংশীয় সম্রাট্ তাই-সুঙ্ চীনে রাজত্ব করিতেছিলেন। ভারতের হুণদের ন্যায় চীনের বহিঃশত্রু ছিল তাতারগণ। সুযোগ পাইলেই তাহারা চীন আক্রমণ করিয়া ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া লইত। সম্রাট্ তাই-সুঙ্ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া সমগ্র চীনে একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই পুনর্গঠিত চীনসাম্রাজ্যের আয়তন ছিল বিশাল। পশ্চিমে কাস্পিয়ান হ্রদ ও পারস্য সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া কোরিয়ার কিয়দংশ পর্য্যন্ত এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিমী তুর্কীগণও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তাঙ সম্রাটদের আমলেই চীনদেশ বর্ত্তমান আকার পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। এই যুগে চীনে যে শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহা প্রায় অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

চীন সম্রাট্ তাই-সুঙ্

সম্রাট্ তাই-সুঙ্ সুনিপুণ সেনাপতি, সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁহার সামরিক প্রতিভায় চীনের সাম্রাজ্য বিশালতর আকার পরিগ্রহ করিয়াছিল। ইহার ফলে চীন সাম্রাজ্য ভারতীয় এবং ইরাণীয় সংস্কৃতির নিবিড়তর সংস্পর্শে আসিয়া পরম

লাভবান হইয়াছিল। হিউয়েনসাঙের ভারত পরিভ্রমণ এবং চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার, চীনা রাজকুমারীর তিব্বত রাজের সঙ্গে বিবাহ এবং তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার এই যোগাযোগের স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

তিনি ধর্ম্মেও উদার মতাবলম্বী ছিলেন। জরথুষ্ট্রীয়, খৃষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকগণকে তিনি সমান সমাদর প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালেই আরব দেশের মুসলমানগণ ক্যাণ্টনের বন্দরে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি পাইয়াছিল। তখন চীনের ধর্ম্ম-জগতে ছিল ভগবান্ বুদ্ধের অবাধ রাজত্ব। তাই-সুঙের প্রায় ১০০ বৎসর পরে সুয়ান্-সুঙ্ সম্রাট্ হন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার জন্য লোকে তাঁহাকে বলিত মিঙ্ হুয়াঙ্ বা সর্ব্বগুণসম্পন্ন সম্রাট্।

তাঙ সম্রাটগণ প্রায় ৩০০ বৎসর কাল চীনে রাজত্ব করেন। বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী ও রাজ-কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদা নিয়োজিত থাকিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকগণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে রাজকর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হইতেন। চীনদেশ তখন ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। চীনা বণিকগণ ইন্দোচীনে, মালয়ে, দ্বীপময় ভারতে, পারস্যোপসাগরে ও অন্যান্য স্থানে বাণিজ্যের জন্য যাইতেন। বিদেশ হইতে পর্য্যটকগণও চীনে আসিত।

চতুর্থ শতাব্দীর শেষে ক্যাণ্টনের উপকণ্ঠে অনেক আরব দেশীয় লোক বাস করিত। কথিত আছে যে, এক সময়ে চীনের একটি প্রদেশেই তিন সহস্র ভারতীয় সাধু ও দশ সহস্র ভারতীয় পরিবার

বাস করিত। ইহারা চীন দেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারে অগ্রণী হইয়াছিল ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সম্রাট্ মিঙ্ হুয়াঙের পৃষ্ঠপোষকতায় চীনা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি ঘটে। তিনি ৭২৫ খৃষ্টাব্দে একটি সাহিত্য পরিষদ গঠন করেন এবং সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
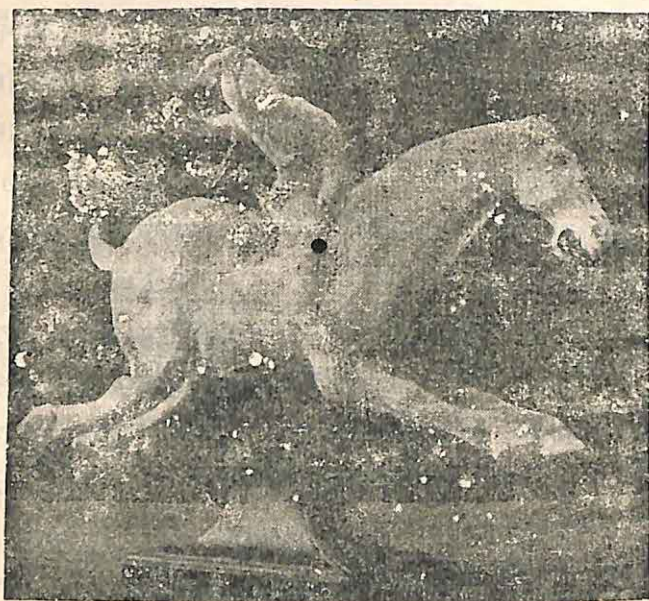
তাঙ-যুগে নির্ম্মিত পোলো ক্রীড়ারত চীনা মহিলার মৃন্ময়মূর্ত্তি

কবি লি-পো এবং তু-ফু চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। বস্তুতঃ ভারতীয় ইতিহাসে গুপ্তযুগের যে স্থান, চীনের প্রাচীন ইতিহাসে তাঙ যুগও সেইরূপ গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া আছে।

শুধু সাহিত্যে নহে; সুকুমার শিল্পেও এই সময় অনেক উন্নতি

হইয়াছিল। চীনারা চিত্রকে বলে 'মূক কাব্য' ; তাই তাহারা চিত্রকে দিয়াছে কাব্যের সৌন্দর্য্য ও মর্য্যাদা। প্রাকৃতিক চিত্র অঙ্কনে চীনারা ছিল সিদ্ধহস্ত।

তাঙ-যুগের মৃৎশিল্পও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অনেক স্থলে চীনের মৃৎশিল্পীরা ইরাণ, ভারত ও গ্রীস হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। পোর্সেলিন শিল্পের উন্নতি ও কাঠের ছক করিয়া কাগজ মুদ্রিত করাও চৈনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির পরিচায়ক। বৌদ্ধগ্রন্থের প্রচারের উদ্দেশ্যেই চীনা বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক এইভাবে প্রথমে মুদ্রণকার্য্যের আবিষ্কার হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় সভ্যতা ও বৃহত্তর ভারত

সূচনা—আর্য্য সভ্যতা শুধু ভারত জয় করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; ভারতের বাহিরেও বহু দেশে এই সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়াছিল। মধ্যযুগের বহু পূর্ব্বেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। "এরিথ্রিয়ান সাগরের পেরিপ্লাস" নামক একখানি পুস্তক হইতেই জানা যায় যে, পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক কত নিবিড় ছিল। ভারতের উপকূল ভাগে বহু বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সকল বন্দর হইতে ভারতীয় শ্রমে ও মূলধনে নির্ম্মিত সমুদ্রগামী জাহাজে চড়িয়া ভারতীয় নাবিকগণ দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করিত। মণিমুক্তা, হীরা, জহরত ও সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রে তাহাদের সওদাগরী জাহাজগুলি পরিপূর্ণ থাকিত। বন্দরগুলি হইতে দেশের অভ্যন্তরে পণ্যদ্রব্যের যাতায়াতের জন্য বহু রাজপথও নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিদেশী সম্রাটগণের দরবারেও ভারতীয় রাজন্যদের আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছিল।

ভারতীয় বাণিজ্যের সহিত ভারতীয় ধর্ম্মও বিদেশে বিস্তারলাভ করে। তখন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ভারতীয় বণিকগণ নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিল। ভারতীয়গণ মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করিল। কোথাও কোথাও

বা গড়িয়া তুলিল নূতন রাজ্য। স্থানীয় অনগ্রসর আদিম সভ্যতা উন্নত ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এক নূতন রূপ ও নূতন গৌরব লাভ করিল।

মধ্য-এশিয়া—মধ্য এশিয়ায় বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছাড়াও ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বহু নিদর্শন মিলিয়াছে। কাস্পিয়ান সাগর হইতে চীনের মহাপ্রাচীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের যাযাবর শ্রেণীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মই বহুকাল একমাত্র সর্ব্বজনস্বীকৃত ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাহার মূলে ছিল কুশান নৃপতিদের

রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ভিক্ষু, শ্রমণ ও সন্ন্যাসীদের অমিত উৎসাহ। আধুনিক খোটান নগরীর চতুষ্পার্শ্বে অনেক ভারতীয় নরনারী বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

বর্ত্তমানে সেই ধর্ম্মের বাহ্য আকার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তাই আপাতঃদৃষ্টিতে বুঝা কঠিন যে, এককালে উত্তর গোবী মরুভূমির এই অঞ্চলটিতে কত সমৃদ্ধিশালী ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ওরেলস্টাইনের চেষ্টায় বালির স্তূপের নীচ হইতে অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠের ধ্বংসাবশেষ এবং বুদ্ধমূর্ত্তি ও দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় ভাষায় ও অক্ষরে লিখিত বহু পুঁথি ও সংক্ষিপ্ত নজীরও তথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ওরেলস্টাইন বলিয়াছেন যে, অনুসন্ধানের কালে মাটির নীচে থাকিবার সময় তাঁহার শুধু মনে হইতেছিল, তিনি যেন পঞ্জাবের কোন এক সহরে আসিয়া পড়িয়াছেন। সপ্তম শতাব্দীতেও হিউয়েনসাঙ এই অঞ্চল দিয়া যাইবার সময় সর্ব্বত্র বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কাহারও মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিশ্বজয়ী চেঙ্গিস খাঁও এক প্রকারের বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

পূর্ব্ব-এশিয়া—মধ্য-এশিয়া হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে প্রচলিত হইল। চীনদেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর আজিও এই ধর্ম্মে অখণ্ড বিশ্বাস। চীন হইতে দলে দলে বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য ও বৌদ্ধপুঁথি সংগ্রহের আশায় ভারতে আসিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষ হইতেও বহু পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে চীনে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অসংখ্য বৌদ্ধ পুঁথি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ভারতীয় ভাষা হইতে চীনের

ভাষায় অনুবাদ করিবার কাজে তাঁহাদের সাহায্য অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। ধর্ম্মজগতের সম্পর্ক ব্যতীত ভারতের সহিত চীনের রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কও বিদ্যমান ছিল। জলযানে ভারতে ও চীনে অব্যাহত যোগাযোগ ছিল।

ক্রমে চীন হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম কোরিয়া ও জাপানে বিস্তৃত হয়। ঐ উভয় দেশেরই বহুলোক আজিও বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী।

মহারাজা শ্রীহর্ষের সমসাময়িককালে তিব্বতরাজ শ্রং-সাম-গ্যাম্পো তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় লিপির প্রচার করেন। তিনি নেপাল ও চীনের যে দুই রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী। তাঁহাদের প্রভাবেই তিব্বতরাজ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ কারিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে চীনের ন্যায় তিব্বতী পণ্ডিতগণও নালন্দা ও বিক্রম-শীলায় অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। একাদশ শতাব্দীতে

অতীশ-দীপঙ্কর

পালরাজগণের সময় পূর্ব্ববঙ্গের **অতীশ-দীপঙ্কর** তিব্বতে গমন করেন। সেখানকার বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কার তাঁহার অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া—ভারতীয় সভ্যতার প্রসার কেবলমাত্র মধ্য-এশিয়া, চীন, তিব্বত, কোরিয়া ও জাপানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি

বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সুদূর প্রাচ্যের অনেক জায়গার নাম ছিল **সুবর্ণভুমি** বা **সোনার দেশ**। মালয় উপদ্বীপ, কাম্বোডিয়া, আনাম, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানের নরপতিগণের ভারতীয় নাম ছিল এবং তাঁহাদের শিলালিপিগুলি ছিল সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৌদ্ধ ও শৈব ধর্ম্মের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতীয় বণিকদের যে দুঃসাহসিক অভিযানের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার প্রসার হয়, তাহার অনেক কাহিনী 'বৌদ্ধ-জাতক' ও 'কথাসরিৎসাগরে' লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ভারতীয় সভ্যতা ইন্দোচীনেও প্রবেশ করিয়াছিল। সে-যুগে এখানে দুইটি বিখ্যাত রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। একটির নাম ছিল **কম্বুজ**, অপরটির নাম **চম্পা**। খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণ কাম্বোডিয়ার কম্বুজ প্রদেশ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার রাজারা প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন। কম্বুজের বিখ্যাত রাজা **যশোবর্ম্মণ** একটি নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। সেকালে ইহার নাম ছিল **যশোধরপুর**। যশোধর-গিরি বা ফোমবাখেন পাহাড়ের উপর রাজপ্রাসাদটিকে একটি চিত্রের মত দেখাইত। সহরটি পাহাড়ের উভয় পার্শ্বে পরিব্যাপ্ত ছিল। আঙ্কোর থোমের অনেকটা অংশ এই রাজধানী যশোধরপুরের অন্তর্গত ছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাংশে সম্রাট্ সপ্তম জয়বর্ম্মণ **আঙ্কোর থোমে** রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার গৌরব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। এক সময়ে ইহার লোকসংখ্যা ১০ লক্ষেরও বেশী ছিল। সহরটি চতুষ্কোণ ছিল; প্রত্যেকটি পার্শ্বদেশ ছিল দুই মাইলেরও

বেশী দীর্ঘ। পরিখা ও প্রাচীর দিয়া সহরটিকে সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। উহার সিংহদ্বার, তোরণ, রক্ষীগৃহ প্রভৃতি সুনিপুণ স্থাপত্য-শিল্পের পরিচায়ক।

সহরের কেন্দ্রস্থলে ছিল বেয়োনের শিবমন্দির। একশত ফুট প্রশস্ত পাঁচটি ছায়াবীথি সহরের একপ্রান্ত হইতে মন্দির পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। একটি মন্দিরগাত্রের উৎকীর্ণলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, কম্বুজের গৌরবময় যুগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থলে ৭৯৮টি মন্দির এবং ১০২টি আরোগ্যশালা বা হাসপাতাল ছিল। মন্দিরের কাজে ৬৬,৬২৫ জন লোক নিয়োজিত ছিল এবং উহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ৩,৪০০টি গ্রাম দান করা হইয়াছিল। রাজধানীতে অনেক মনোরম শান-বাঁধানো দীঘি ছিল। দীঘিতে নৌকা বিহারের বিপুল আয়োজন ছিল। এতদ্ব্যতীত রথ ও হস্তীর সমারোহ সাম্রাজ্যের মহিমা ঘোষণা করিত। কম্বুজে অনেক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন এবং কোন কোন ভারতীয় ব্রাহ্মণ রাজ-পরিবারেও বিবাহ করিয়াছিলেন। কম্বুজের স্থাপত্য-গৌরবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল **বেয়োনের মন্দির** ও **আঙ্কোর ভাট**।

বেয়োনের মন্দিরটি দেখিতে পিরামিডের মত, তিন ধাপে উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। উহার চল্লিশটি চূড়া আছে; কেন্দ্রীয় চূড়াটি প্রায় ১৫০ ফুট উচ্চ। প্রত্যেকটি চূড়ার চতুষ্পার্শ্বে ধ্যানমগ্ন শিবের মূর্ত্তি ছিল। ইহার একটু দূরেই ছিল **আঙ্কোর ভাটের** মন্দির। ইহার পরিকল্পনা, আয়তন ও শিল্প-চাতুর্য্য ছিল অসাধারণ। সম্রাট্ দ্বিতীয় **সূর্য্যবর্ম্মণ** (১১১৩—১৪ খৃষ্টাব্দ) ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রথম গ্যালারীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০ ফুট। কেন্দ্রীয় চূড়াটি ভূমিতল হইতে প্রায় ২১০ ফুট উচ্চ। ইহা প্রথমে বিষ্ণু
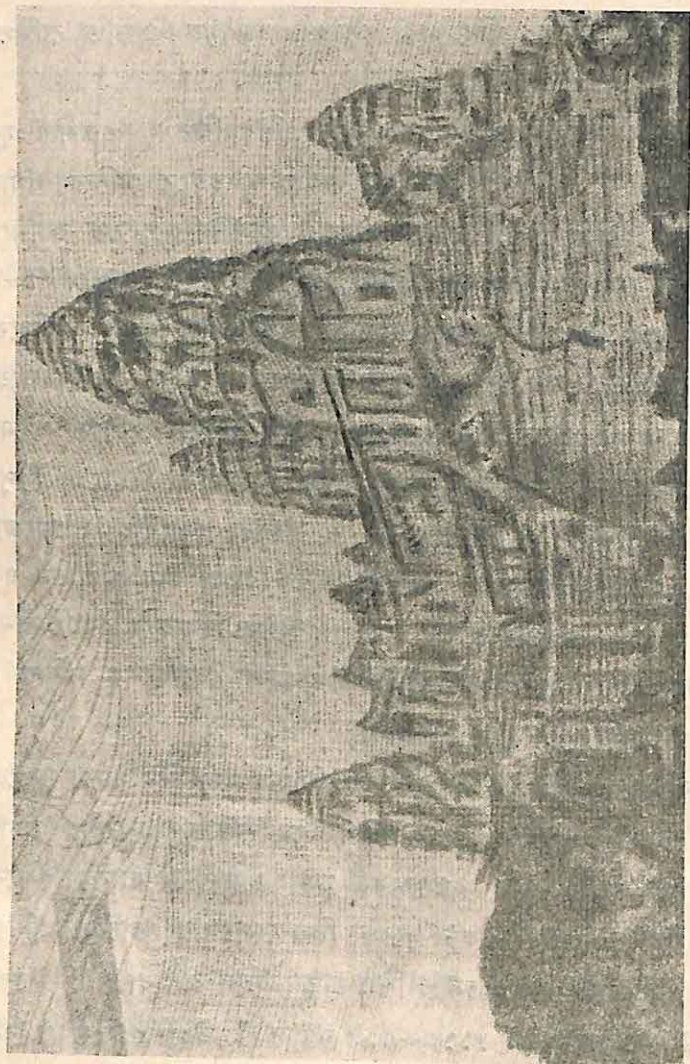
আঙ্কোর ভাট

মন্দির ছিল। সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তির সমাবেশে আঙ্কোর ভাট আজিও বিশ্বের বিস্ময় হইয়া রহিয়াছে।

ইন্দোচীনের আর একটি রাজ্যের নাম ছিল **চম্পা**। ইহাকে মোটামুটি বর্ত্তমান আনাম রাজ্য বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে এখানে ভারতীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হয়। তারপরে দীর্ঘ ১৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত ইহার গৌরব অব্যাহত ছিল। এই যুগের শেষে আনামী ও মঙ্গোলদের আক্রমণে এই রাজ্যটি অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই রাজ্যে অনেক সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল এবং বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ছিল।

মালয় উপদ্বীপ এবং ইন্দোনেশিয়া বা দ্বীপময় ভারতেও ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার আমাদের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দেই যবদ্বীপে হিন্দু সভ্যতার বিস্তার হয়। অষ্টম শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা, বলি, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপের উপর শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণ আধিপত্য বিস্তার করেন। যে-সমস্ত আরব বণিক্ ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে দ্বীপময় ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতার কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। শৈলেন্দ্র রাজাকে তাঁহারা **মহারাজ** আখ্যা দিয়াছেন। কথিত আছে যে, মহারাজ প্রতিদিন প্রত্যূষে একটি স্বর্ণনির্ম্মিত ইট হ্রদে নিক্ষেপ করিতেন। আর একজন আরব লেখক বলিয়াছেন যে, মহারাজের কোষাগারে দৈনিক দুইশত মণ স্বর্ণ সঞ্চিত হইত। শৈলেন্দ্র রাজগণ ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক। বঙ্গদেশের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। শৈলেন্দ্র নৃপতি বালপুত্রদেব পাল সম্রাট্ দেবপালের অনুমতি লইয়া

নালান্দায় একটি বৌদ্বমঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী ভিক্ষু কুমার ঘোষ ছিলেন একজন শৈলেন্দ্র রাজার গুরু। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতা বরবুদুরের বিখ্যাত স্তূপে রূপায়িত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে। যবদ্বীপের একটি পর্ব্বত শিখরে অবস্থিত এই স্তূপটি আজিও তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। ইহা নয়টি ধাপে ঊর্দ্ধপানে উঠিয়া গিয়াছে; স্তূপের পাষাণ গাত্রে কত বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; ধ্যানী-বুদ্ধের মূর্ত্তিই হইবে ৪৩২টি। ধাপে ধাপে যে সমস্ত মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে, তাহার সারি হইবে ১৫০০টি। বস্তুতঃ কম্বুজের আঙ্কোর ভোট ব্যতীত শিল্পীর এতবড় বিরাট সৃষ্টির প্রয়াস আর কোথাও দেখা যায় নাই। ইহাকে পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দ্বীপময় ভারতে রামায়ণ এবং মহাভারতেরও গভীর সমাদর ছিল। অনেক কাব্য, সাহিত্য, ছায়ানাট্য উহাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে; ভারতের মহাবলীপুরমের মত এখানকার অনেক মন্দির পাণ্ডব বীরগণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়া আজিও মহাভারতের জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দিতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম শ্যাম, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ব্রহ্ম এবং সিংহলে ভারতীয় সভ্যতার প্রচার হয় খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে আর শ্যামদেশে হয় দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ কৌশলে আজিও ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

সমগ্র এশিয়াব্যাপী ভারতীয় সভ্যতার এই বিজয় অভিযান এশিয়ার ইতিহাসে এক অভিনব বিস্ময়কর কাহিনী। চীনদেশও এই
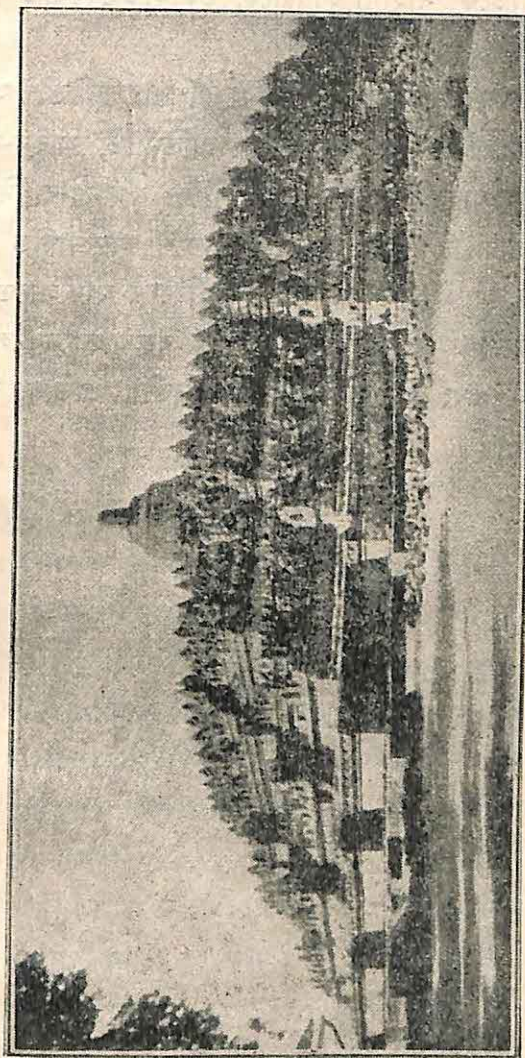
পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য বরবুদুরের স্তূপ

সভ্যতার অগ্রগতিকে সাহায্য করিয়াছে, কোথাও কোথাও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

এইরূপে দীর্ঘকাল ধরিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভারতীয় ধর্ম্ম, ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় রীতিনীতি, আইন-কানুন এবং ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থাই স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতার মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই সমস্ত পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলিও উন্নততর জীবনের স্বাদ লাভে সমর্থ হইয়াছিল। আজিও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বহু স্থানে লোকের দৈনন্দিন জীবনে এবং আচার-ব্যবহারে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

ইস্‌লামের অভ্যুত্থান

সূচনা—খৃষ্টধর্ম্ম ও ইহুদী ধর্ম্মের মত ইস্‌লামের অভ্যুদয় হয় পশ্চিম এশিয়ায়। ইহা যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় ছয় শত বৎসর পরের ঘটনা। তখন ভারতবর্ষে মহারাজ শ্রীহর্ষ রাজত্ব করিতেছেন। যে স্থানটিকে কেন্দ্র করিয়া এই নূতন ধর্ম্মের দিগ্বিজয় সুরু হইল, তাহা খৃষ্ট ও ইহুদী ধর্ম্মের প্রাচীন লীলাভূমি হইতে দূরে নহে, আরব দেশের পশ্চিম প্রান্তে লোহিত সমুদ্রেরই তীরে। বস্তুতঃ ইস্‌লাম খৃষ্ট ও ইহুদী ধর্ম্ম হইতে যথেষ্ট অবদান গ্রহণ করিয়াছে। এই নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **হজরত মহম্মদ**।

মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে আরব দেশের অবস্থা—আরব দেশের দিগন্ত প্রসারিত বালুকারাশির মাঝে আছে মরূদ্যান ও সহর। এখানে বহু প্রাচীন সভ্যতার উত্থান-পতন হইয়াছে। সুমেরীয়, বাবীলনীয় ও ফিনিসীয় গৌরবের ইহাই লীলাভূমি ও সমাধিক্ষেত্র। হজরত মহম্মদের জন্মের প্রাক্কালে আরব দেশ প্রাচীন কালের মত উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল না। দুই শ্রেণীর লোক তখন আরব দেশে বাস করিত—একদল ছিল সহরবাসী, আর একদল ছিল যাযাবর বেদুইন। বেদুইনের প্রিয় সঙ্গী ছিল ঘোড়া ও উট। মেষ ও উট প্রতিপালন, শিকার, দূর-দূরান্তরে লুঠতরাজের জন্য হানা দেওয়াই ছিল তাহাদের জীবিকা। বেদুইনরা সামান্য খাদ্য ও পোষাকেই সন্তুষ্ট থাকিত। মরুভূমির প্রচণ্ড সূর্য্যতাপ, পানীয়ের অভাব, দুর্গম পথ এবং খাদ্যাভাব প্রত্যেকটি বেদুইনকে করিয়াছে কষ্টসহিষ্ণু ও অসীম

বলশালী। তাহারা স্বাধীনতার পূজারী ছিল। পানীয় জল এবং খাদ্য-শস্যের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতাই মরুভূমির অধিবাসিগণকে বহু দলে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিল। বেদুইন-জীবনে মারামারি কাটাকাটি দৈনন্দিন ব্যাপার হইলেও আতিথেয়তা ছিল তাহাদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ প্রাচীন যুগের আরব কবিরা আতিথেয়তা, সহনশীলতা এবং পৌরুষই আরব জাতির শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পুরুষের বহু বিবাহ করাকে আরবগণ কখনও নিন্দনীয় মনে করে নাই।
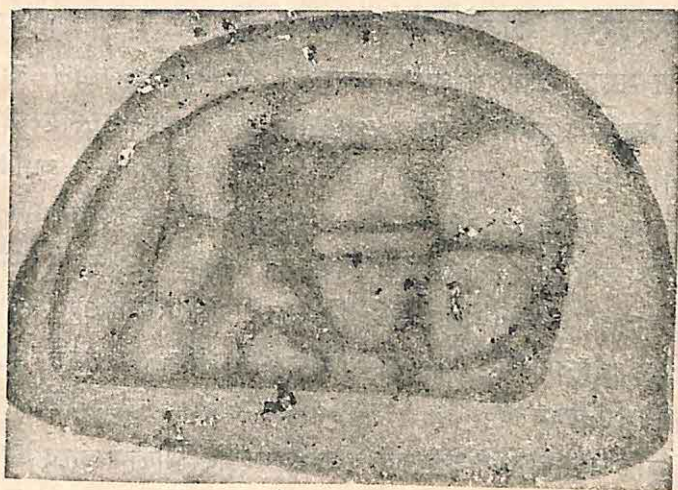
কাবার পবিত্র কৃষ্ণপ্রস্তর

আরবেরা ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে বহু দেবদেবীর উপাসনা করিত। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গাছ, পাথর তাহাদের উপাস্য ছিল। একমাত্র কাবাতেই ৩৬০টি দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানকার

প্রধান মন্দিরের কৃষ্ণপ্রস্তরটিকে তাহারা ভয় ও অন্ধভক্তির সহিত পূজা করিত। এই সমস্ত অসংখ্য দেবদেবীর প্রধান ছিলেন মক্কার দেবতা **আল্লাহ্**। মক্কা তখন আরব জগতের শ্রেষ্ঠ সহর ছিল। যুগ যুগ ধরিয়া অগণিত ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী এখানে তীর্থ করিতে আসিয়াছে। ইস্‌লামের অভ্যুদয়ের পর সারা বিশ্ব হইতে যাত্রীরা আসিয়াছে এই তীর্থে। এই তীর্থ দর্শনের নাম হজ করা। আরবেরা শুধু যোদ্ধা ছিল না ; তাহারা সাহিত্য রচনাতেও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রাক্-ইস্‌লামীয় গদ্য সাহিত্য খুব উন্নত না হইলেও কবিতা এবং কাশীদ বা গাথা রচনাতে তাহারা অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে।

মহম্মদের জীবনী—৫৭০ (মতান্তরে ৫৭১) খৃষ্টাব্দে হজরত মহম্মদ মক্কার কোরেশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কোরেশ বংশ-ই ছিল মক্কার প্রধান মন্দিরের পুরোহিত। জন্মের পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা আবদুল্লার মৃত্যু হয়। ছয় বৎসর পর মাতা আমিনাও পরলোক গমন করেন। তখন বালক মহম্মদকে লালন পালন করিবার ভার পড়ে পিতামহ ও পিতৃব্যের উপর। সে সময়ে আবার দেশে লেখাপড়ার বিশেষ চর্চ্চা ছিল না, তাই মহম্মদও লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। তবে তিনি বাল্যকাল হইতেই বিশেষ চিন্তাশীল ছিলেন।

কুড়ি বৎসর বয়স হইতেই হজরত মহম্মদ স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। মক্কার ধনী অধিবাসীদের প্রতিনিধি রূপে তিনি বিদেশে বাণিজ্য করিতেন। সকলেই তাঁহার সততায় মুগ্ধ ছিলেন। হজরত মহম্মদের ২৫ বৎসর বয়ক্রমকালে খাদিজা নাম্নী মক্কার একজন সম্ভ্রান্ত ধনবতী বিধবা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বামীরূপে বরণ করেন।

এই সময়ে আরবগণের জীবন অত্যন্ত কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশবাসীদের অধঃপতন দেখিয়া হজরত মহম্মদ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। মাঝে মাঝে তিনি মক্কার নিকটবর্তী **হীরা** নামক একটি পর্ব্বত-গুহায় গিয়া ধ্যানমগ্ন হইতেন। অবশেষে তিনি একদিন দেবদূত জিব্রাইলের মারফৎ স্বর্গীয় আদেশ পাইলেন। তখন তিনি প্রচার করিলেন—"আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই এবং হজরত মহম্মদ হইতেছেন তাঁহারই প্রেরিত পুরুষ।" তিনি যে নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন তাহার নাম হইল **ইস্‌লাম**। আর যিনি এই ধর্ম্মমত গ্রহণ করিবেন তিনি হইবেন **মুসলমান**।

ঐশীবাণী লাভের পর হজরত মহম্মদ ইস্লাম ধর্ম্ম প্রচারে মনোযোগ দিলেন। তখন হইতেই তিনি কোরেশদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। পত্নী খাদিজাবিবি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার পর দীক্ষিত হন হজরত আলি। ইনি পরবর্ত্তী যুগে চতুর্থ খলিফা হইয়াছিলেন। আবুবকর ছিলেন হজরত মহম্মদের একজন বন্ধু। তিনি ইস্‌সাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এইরূপে ক্রমেই ইস্লামের শক্তিবৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাতে কোরেশগণ প্রকাশ্যে হজরত মহম্মদের বিরোধিতা আরম্ভ করেন। তাঁহারা হজরত মহম্মদকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করিয়াও ব্যর্থ হন। তাঁহার পর আরম্ভ হইল মুসলমানদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন। হজরত নীরবে সকল রকম উৎপীড়ন সহ্য করিতে লাগিলেন। এই ভাবে ইস্লাম ধর্ম্ম প্রচারের ষষ্ঠ বৎসর আসিল। সে বৎসরের স্মরণীয় ঘটনা হইল হজরত ওমরের শিষ্যত্ব গ্রহণ। হজরত মহম্মদ যে পিতৃব্যের গৃহে বাস

করিতেন, কোরেশগণের ভিতর তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। হজরত মহম্মদের পিতৃব্যের অপ্রতিহত ক্ষমতার জন্য শত্রুগণ এতদিন তাঁহার কোন শারীরিক ক্ষতি করিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে দশম বৎসরে তিনি সেই পিতৃব্য এবং পত্নী খাদিজা বিবিকে হারাইলেন। অতঃপর ক্রমেই বিধর্ম্মীদের নিপীড়ন অসহ্য
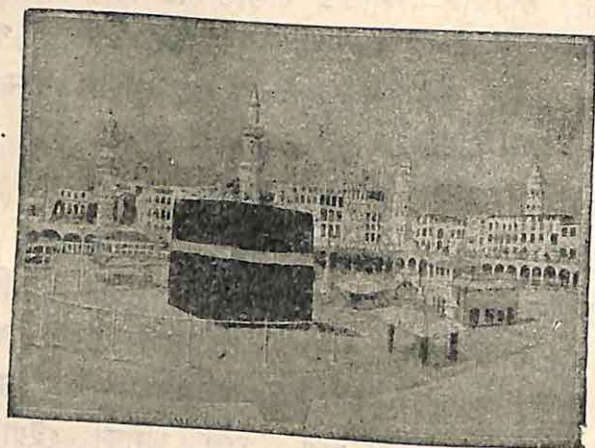
কাবা শরিফা

হইয়া উঠিলে তিনি শিষ্যগণ সহ ৬২২ খৃষ্টাব্দে মদিনায় পলায়ন করিলেন। তাঁহার পলায়নের পথের সহচর ছিলেন আবুবকর। পলায়নের সংবাদ শুনিয়া কোরেশদের সৈন্যগণ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। গত্যন্তর না দেখিয়া তাঁহারা পাশের একটি গুহায় আত্মগোপন করেন। সৈন্যগণ গুহার সম্মুখে আসিয়া, অভ্যন্তরে তরবারি প্রবেশ করাইয়াও কাহারো অস্তিত্ব বুঝিতে না পারিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়। দৈববলে অতি

অল্পের জন্য হজরত মহম্মদের প্রাণ রক্ষা হইল। এই পলায়নই হিজরা নামে বিখ্যাত। এই সময় হইতে মুসলমানদের সন গণনা করা হইয়া থাকে।

মদিনায় আসিয়া মহম্মদ সেখানকার লোকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একটি ক্ষুদ্র ইস্‌লাম রাষ্ট্র গঠন করেন এবং তিনি তাহার নেতা হন। ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা এবং দেশ-শাসনের দায়িত্বও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহার শাসনকালে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল প্রজাই সুখে শান্তিতে বাস করিত। ইহুদীদিগের প্রতিও তিনি সদয় ব্যবহার করিতেন। এ সময় মক্কার সহিত তাঁহার নিরন্তর যুদ্ধ লাগিয়াই থাকিত। অবশেষে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিবার পর ৬৩০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের বিজয়ী বাহিনী মক্কায় প্রবেশ করিল। বিজয়ী সৈন্যগণ কোরেশদের সমস্ত দেবমূর্ত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল বটে, কিন্তু মক্কাবাসীদের উপর তাহারা কোনরূপ অত্যাচার করে নাই। মহম্মদ পরাজিত শত্রুগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে কার্পণ্য করিতেন না। অতঃপর তিনি বাইজানটাইন, চীন ও পারস্যের সম্রাট্‌গণকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। ৬৩২খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন অকস্মাৎ তীব্র মাথার যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হইয়া পড়েন। সেই শয়নই তাঁহার শেষ শয়ন। এইরূপে এক মহান্ কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইল।

ইসলাম ধর্ম্ম—মুসলমানদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থের নাম কোরাণ। তাহারা মনে করে যে মূল কোরাণগ্রন্থ সপ্তম স্বর্গে রক্ষিত আছে এবং উহার বাণী আল্লাহ্‌তা'লা দেবদূতের মারফত হজরত মহম্মদকে প্রদান করিয়াছেন। মুসলমানেরা ইহাকেই ঈশ্বরের শেষ গ্রন্থ বলিয়া মনে করে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই ইস্‌লাম ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছে। কোরাণের মূলমন্ত্র হইল—ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়;

হজরত মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত **রসুল** বা **মহাপুরুষ** (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহম্মদুর রসুল উল্লাহ্)। কোরাণে বিশ্বাস, দিনে পাঁচবার নামাজ আদায় করা, রমজান-মাসে উপবাস করা, জাকাত বা দান করা, মক্কায় হজ করা ও জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধে যোগ দেওয়া—প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে সমস্ত ধর্ম্ম একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবারও বিধান দেওয়া আছে কোরাণে। এই সত্যধর্ম্ম সমগ্র বিশ্বে প্রচার করা মুসলমানদিগের পবিত্র ব্রত। ধর্ম্ম-জীবনের নিয়ম, সংযম, সাম্যভাব ও ভ্রাতৃত্ব দূরদূরান্তরের মুসলমানকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে। ইহা আরব জাতির চরিত্র ও নৈতিক আদর্শকে উন্নত করিয়াছে সন্দেহ নাই।

ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার ও দিগ্বিজয়—মহম্মদ মরুভূমির যাযাবরদিগকে দিলেন এক নূতন ধর্ম্মভাব। ইস্‌লামের পতাকাতলে একত্রিত হইয়া এই ধর্ম্মোন্মত্ত আরবজাতি দিগ্বিজয়ে বাহির হইল। মহম্মদের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসরের মধ্যেই আরবেরা সিন্ধু উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া স্পেন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইস্‌লামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিল। সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, আর্ম্মেনিয়া, পারস্য, সিন্ধু উপত্যকা ও পশ্চিম তুর্কীস্থানে ইস্‌লামের জয়পতাকা উড়িল। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ তীর বেষ্টন করিয়া অর্দ্ধচক্রাকারে আরব সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই বিজয় অভিযানের তুলনা নাই। আরবগণ যেন সহসা মরুভূমির ঘুর্ণিবাত্যার মত বিদ্যুৎগতিতে সভ্যজগতে ছড়াইয়া পড়িল এবং রোমান সাম্রাজ্য হইতেও এক বিশালতর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিল। আরবগণ বিজিত

সভ্যজাতির সংস্পর্শে আসিয়া নিজেরাও বহুল পরিমাণে সভ্য হইয়া উঠিল।

মুসলমানদের খলিফা বা ধর্ম্মগুরু—হজরত বা মহাপুরুষ মহম্মদের মৃত্যুর পর আরবদের নেতা হইলেন খলিফা আবুবকর। খলিফারা ছিলেন ইস্‌লাম জগতের শাসক ও ধর্ম্মরক্ষক। মহাত্মা আবুবকরের মৃত্যুর পর ক্রমে ক্রমে **ওমর, ওসমান ও আলি** খলিফা নিযুক্ত হন। এই চারিজনকে **"ধর্ম্মপ্রাণ খলিফা"** বলা হয়।

আবুবকর ছিলেন মহম্মদের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিষ্যের অন্যতম। তাঁহারই কন্যা আয়েষাকে হজরত মহম্মদ পরে বিবাহ করিয়াছিলেন। মদিনায় পলায়নকালে আবুবকরই ছিলেন হজরতের অন্যতম সঙ্গী। তিনি ছিলেন শীর্ণকায়, গৌরবর্ণ, রঞ্জিত-শ্মশ্রু এবং ন্যুব্জদেহ। ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার অর্থের অহঙ্কার ছিল না। তাঁহার জীবনযাত্রা ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। অনেক সময় তিনি রাত্রিতে ছদ্মবেশে বিপদাপন্ন এবং দুস্থ লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বাহির হইতেন। মহম্মদের শিষ্যদের মধ্যে তিনিই অগাধ জ্ঞান ও অতুলনীয় দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। খলিফা হইবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার প্রভূত সম্পদ্ দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য দান করিয়াছিলেন। হজরত ওমরকে পরবর্তী খলিফা নির্ব্বাচন করিয়া তিনি যে উপদেশ দেন, তাঁহার তুলনা মেলা ভার। তাঁহার মৃত্যুশয্যায় হজরত মহম্মদের বিধবা পত্নী, স্বীয় কন্যা আয়েষা পিতার নিকটে আসিলে তিনি তাঁহাকে বলেন যে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ জনসাধারণের ভাণ্ডার হইতে লইতে হইয়াছে। উক্ত সামান্য অর্থ লওয়াও অন্যায়

হইয়াছে মনে করায় তিনি পুত্রগণকে এই নির্দেশ দিয়া যান, যেন তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে সে-অর্থ রাজকোষে প্রত্যর্পণ করা হয়। মৃত্যুকালে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের অধীশ্বর হইলেও তিনি একজন হাবসী দাস ও একটি মাত্র উট রাখিয়াছিলেন।

মুসলমানদের ইতিহাসে দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ এক যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি প্রথমে হজরত মহম্মদের ঘোরতর শত্রু ছিলেন। একদা হজরত মহম্মদকে হত্যা করিবেন বলিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তিনি পথে বহির্গত হন। কিন্তু পথিমধ্যে শুনিতে পান—তাঁহার স্নেহের ভগিনীও ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ঝড়ের বেগে ভগিনীর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ইচ্ছা ছিল, আগে ইহাদের হত্যা করিয়া পরে হজরতকে হত্যা করিবেন। কিন্তু তাঁহার উদ্যত খড়্গের নীচে বসিয়া যখন সাশ্রুনয়নে ভগিনী ও ভগিনীপতি উভয়ে কোরাণের শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন, তখন সে-দৃশ্যে ওমরের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি সেই মুহূর্ত্তেই তরবারি পরিত্যাগ করিয়া হজরত মহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কালক্রমে নিজগুণে তিনি মহম্মদের শিষ্যদের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠেন। গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠদেহ, দীর্ঘকায় এই মহাপুরুষের স্বভাব ছিল শিশুর মত সরল। তিনি মিতব্যয়ী, দৃঢ়চেতা ও অনাড়ম্বর ছিলেন।

একবার পরাজিত পারস্য সম্রাটের দূত প্রত্যূষে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। কোথাও তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া যখন তিনি হতাশ হইয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তখন অবাক্ বিস্ময়ে দেখিলেন—বিরাট আরব

সাম্রাজ্যের খলিফা অতি সাধারণ ভিক্ষুকের ন্যায় মসজিদের সিঁড়ির উপর শুইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ
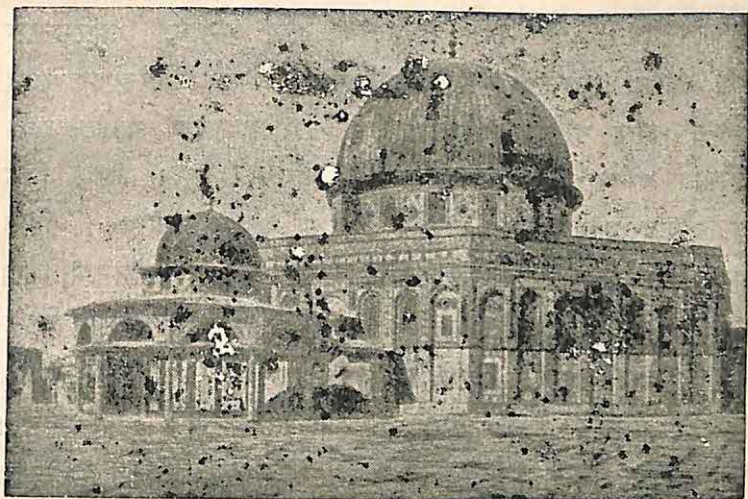
"ডোম অব দি রক্ষ" বা পর্ব্বত গম্বুজ

ছিল শতছিন্ন এবং শয্যা ছিল খর্জ্জুরপত্রের। আরব সাহিত্যও তাঁহার ন্যায়বিচারের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। কথিত আছে যে, একদা এক বেতুইন তাঁহার শরণার্থী হইলে তিনি ক্রোধের বশে তাহাকে কয়েকবার বেত্রাঘাত করেন। পরমুহূর্ত্তে অনুতপ্ত খলিফা বেতুইনের নিকট ক্ষমা চাহিয়া নিজের উন্মুক্ত পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে বলেন। বেতুইন অস্বীকার করিলে খলিফা বিষণ্ন চিত্তে গৃহে ফিরিয়া যান।

কারবালা—হজরত ওমরের মৃত্যুর কয়েক বছর পরের কথা। খলিফা ওসমান এবং আলি গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলে আরব

জগতে সঙ্কট ঘনাইয়া আসিল। খলিফা পদ লাভের জন্য অনেকেই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

মহাপুরুষ মহম্মদের কন্যা ফতেমাকে খলিফা আলি বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহাদের পুত্র হাসান, হোসেনকে কেন্দ্র করিয়া এক শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। শত্রু চক্রান্তে হজরতের দৌহিত্র পঞ্চম খলিফা **হাসানকে** খলিফাপদ ত্যাগ করিতে হয়। সিরীয়ার শাসক মোয়াবীয়া তখন খলিফা হন। কথা ছিল মোয়াবীয়ার মৃত্যু হইলে আবার হাসান খলিফা হইবেন। কিন্তু মোয়াবীয়ার মৃত্যুর পর তৎপুত্র এজিদ হাসানকে সিংহাসন না দিয়া নিজেই খলিফা হইয়া বসেন। তাঁহাদের চক্রান্তে হাসান নিহত হন। খলিফা এজিদ ছিলেন নিষ্ঠুর, মদ্যপায়ী এবং চরিত্রহীন। স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক মুসলমানেরা এই খলিফাকে পছন্দ করিতেন না। তাই হজরত আলির দ্বিতীয় পূত্র হোসেন কুফাবাসীদের আমন্ত্রণে খলিফা পদ গ্রহণ করিবার জন্য মক্কা হইতে ইরাকে রওনা হন। ইরাক সীমান্তে পৌঁছাইলে, সহসা ইউফ্রেটিস নদের তীরে জনশূন্য কারবালার প্রান্তরে ঘোড়ার ক্ষুরে বালু উড়াইয়া এজিদের সৈন্য দেখা দিল। হোসেনকে হত্যা করিয়া তাহার মস্তক এজিদকে উপহার দিতে সেনাবাহিনী আসিয়াছে। হোসেনের শত কাতর অনুরোধেও সেনাপতির মন গলিল না। অবশেষে নিদারুণ জল পিপাসায় এবং শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীরে ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ মহম্মদের দৌহিত্র সপরিবারে নিহত হইলেন (৬৮০ খৃষ্টাব্দ)। এই মর্ম্মান্তিক শোচনীয় ঘটনা মহরম মাসে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উহা মহরম নামেই পরিচিত হইয়াছে।

খলিফার পদ লইয়া এই দ্বন্দ্ব অবশেষে ইস্‌লাম-জগৎকে **শিয়া ও সুন্নী** এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া দিল। শিয়াগণ খলিফা হাসানের অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা হজরত মহম্মদের বংশীয় ব্যতীত কাহাকেও খলিফা বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ। সুন্নীগণ সে নীতি স্বীকার করিত না। মুসলমানদের মধ্যে সুন্নীদের সংখ্যাই বেশী।

হারুণ-অল-রশীদ ও বাগদাদ—আরব সভ্যতার চরম উন্নতি হইয়াছিল আব্বাস বংশীয় খলিফাদের রাজত্বকালে। আব্বাস ছিলেন মহাপুরুষ মহম্মদের পিতৃব্য। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে এই বংশের আবুল আব্বাস, খলিফা হোসেনকে যাহারা পদচ্যুত করিয়াছিল, সেই ওমায়েদগণকে পরাস্ত করিয়া খলিফা পদ লাভ করিলেন। তখন ইস্‌লামের সাম্রাজ্য-বিজয় অভিযানের যুগ সমাপ্তপ্রায়। নূতন খলিফাদের আমলে এবার আরবের সংস্কৃতি ও সভ্যতার জয়যাত্রা আরম্ভ হইল। এই বংশের পঞ্চম খলিফা ছিলেন আরব্যোপন্যাসের ও ইতিহাসের বিখ্যাত চরিত্র **হারুণ-অল-রশীদ**।

হারুণ-অল-রশীদের সময় রাজধানী **বাগদাদ** এক স্বপ্নপুরীতে পরিণত হইয়াছিল। ইহা ছিল ইস্‌লামের পবিত্র রাজধানী, সাম্রাজ্যের মর্ম্মস্থল,—সভ্যতা, সৌন্দর্য্য ও বিলাসের লীলা-নিকেতন। আলাদীনের আশ্চর্য্য-প্রদীপ এবং উড়ন্ত কার্পেট না থাকিলেও বাগদাদের ঐশ্বর্য্য ছিল অফুরন্ত। সেই সময় বাগদাদের লোকসংখ্যাও ছিল প্রায় বিশ লক্ষ। টাইগ্রীসের দুইপারে বিস্তৃত রাজধানীর এক-তৃতীয়াংশ ব্যাপিয়া ছিল মোজাইক ও মার্ব্বেল-পাথর নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ, মহিষীদের অন্দর-মহল, রাজকর্ম্মচারী এবং খোজাদের আবাসগৃহ। একজন খলিফার ১১ হাজার

গ্রীক ও সুদানী খোজা-ভৃত্য ছিল। খলিফারা উজীর, কাজী, আমীর প্রভৃতিকে লইয়া সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অসংখ্য অশ্বারোহী, পদাতিক ও দেহরক্ষী সৈন্য ছিল। রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্যের তুলনা ছিল না। ইহার একটি কক্ষে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত বৃক্ষ ছিল ; উহার শাখায় শাখায় স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত পাখীগুলি যন্ত্র-কৌশলে কল-গুঞ্জরণ করিত। সমসাময়িক ঐশ্বর্য্যের একটি চিত্র আরবী সাহিত্যের এক বিবাহের সমারোহ বর্ণনায় অমর হইয়া রহিয়াছে—উজীর-কন্যা বুরাণের সহিত খলিফা আল-মামুনের বিবাহ। বর-কন্যা মুক্তাখচিত স্বর্ণ-মাদুরে বসিয়া আছেন। মাথার উপর সহস্র শিখায় আলো জ্বলিয়া রাত্রিকে দিনে রূপান্তরিত করিয়াছে। কন্যার মাতামহী একটি স্বর্ণপাত্রে করিয়া এক সহস্র দুর্লভ মুক্তা বর-কন্যার মস্তকে বর্ষণ করিলেন। পরে উহা মুক্তার মালা-স্বরূপ গাঁথিয়া কন্যার কণ্ঠে পরাইয়া দেওয়া হইল। রাজপরিবারের লোকদিগকেও বহুমূল্য উপহার দেওয়া হইল ; যাত্রাপথে বর্ষিত হইল স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা। বস্তুতঃ কবি, গায়ক ও নর্তকীর সমারোহ, অসংখ্য মনোরম উদ্যান, স্নানাগার, হাসপাতাল, প্রাসাদোপম অট্টালিকা, টাইগ্রীস নদে অসংখ্য বিলাসতরণী বাগদাদকে সত্যই আরব্যোপন্যাসের স্বপ্নপুরীতে পরিণত করিয়াছিল।

ব্যবসা এবং আমোদ-প্রমোদ—সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তার শিল্প ও ব্যবসায়ে আনিয়া দিল সুবর্ণযুগ। বাগদাদ, কাবা, সিরাজ, দামাস্কাস, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া এবং কর্ডোভাকে কেন্দ্র করিয়া বিপুলায়তন ব্যবসা ও শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল। বাগদাদের বণিকেরা দেশবিদেশের বিলাসদ্রব্য আহরণ করিয়া

বাজারে বিপণি সাজাইয়া বসিল। অভিজাত-মহলে সিল্ক, ব্রোকেড, মসলিন, বহু মূল্যবান্ প্রস্তর-খচিত ঝাড়বাতি এবং বোখারা ও মার্ভেল কার্পেটের খুব চাহিদা ছিল। এই সমস্ত দুঃসাহসী বণিকেরা ব্যবসায় উপলক্ষ্যে চীন, জাভা, সুমাত্রা, সিংহল ও ভারতবর্ষে যাইত। বণিকদের ঐশ্বর্য্যও যেমন ছিল বিপুল, বদান্যতারও তেমনি সীমা ছিল না। বাগদাদ ও সিরাজের একজন অশিক্ষিত ব্যবসায়ী দৈনিক একশত মুদ্রা ভিখারীকে দান করিতেন।

খলিফা হারুণ-অল-রশীদের সভায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত বিজ্ঞজনের সমাবেশ হইত। তাঁহার দরবারে পারসিক, গ্রীক, হিন্দু, খৃষ্টান প্রভৃতি সর্ব্বদেশীয় গুণীর সমাদর হইত। হারুণ-অল-রশীদ সরকার হইতে একটি বিশেষ ভাণ্ডার সৃষ্টি করিয়া তাহার অর্থে প্রাচীনকালের যাবতীয় বিখ্যাত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহার যুগে বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তাঁহার আমলে সঙ্গীত বিদ্যাকে একটি উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানে পরিণত করা হইয়াছিল।

রাজার ভাণ্ডার হইতে অর্থ সাহায্য পাওয়ায় পণ্ডিতদের আর অন্ন-চিন্তায় ব্যস্ত হইতে হইত না। জনৈক পণ্ডিত ভোরে উঠিয়া অশ্বারোহণে যাইতেন। অশ্বারোহণ শেষ হইলে চলিয়া যাইতেন সাধারণের স্নানাগারে। সেখানে স্নানের পর বিশ্রামান্তে সরবৎ পান করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া পড়াশুনা করিতেন। তাহার পর সন্ধ্যায় আবার ভ্রমণ, স্নান ও চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় আহার সমাধা করিতেন।

স্পেনে আরব সভ্যতা—পূর্ব্বোক্ত আবুল আব্বাস যখন ওমায়েদ বংশীয়দের হস্ত হইতে খলিফার শাসনভার কাড়িয়া লন, তিনি তখন ওমায়েদগণকে সবংশে নিধন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবানুগ্রহে এক রাজপুত্র পলায়ন করিতে সমর্থ হন। তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় সমস্ত মুশ্লিম রাজ্যে ঘুরিয়া অবশেষে স্পেনের শাসনকর্ত্তার সহায়তায়
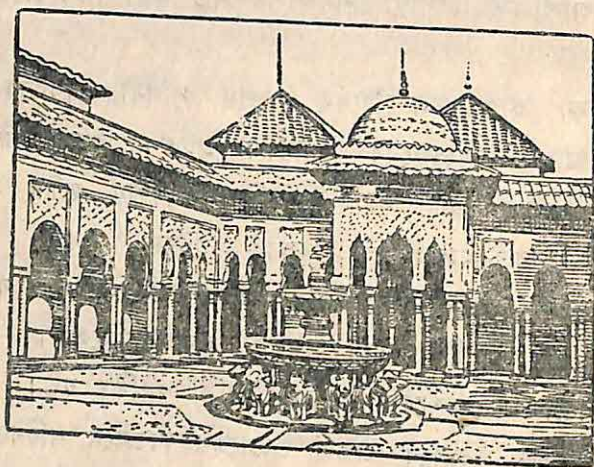
আল্‌হামরার সিংহ-সদনের দৃশ্য

বাগদাদের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া স্পেনে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গড়িয়া তোলেন। তাহার রাজধানী ছিল কর্ডোভা। ঐশ্বর্য্য-গৌরবে এবং সভ্যতায় ইহা বাগদাদের সহিত তুলনীয় ছিল। এখানেও দেশ-বিদেশের পণ্ডিতেরা যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতেন। শাসনকর্ত্তাগণও ছিলেন শিক্ষানুরাগী, বদান্য এবং উদারমতাবলম্বী। এখানকার রাজপ্রাসাদ, উদ্যান, রাজকীয় গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, স্বর্ণরৌপ্য বিজড়িত বড় মসজিদ

ভুবনবিখ্যাত ছিল। বড় মসজিদের স্তম্ভ সংখ্যাই ছিল প্রায় তের শত। অসংখ্য ঝাড়বাতি হইতে উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হইয়া সেখানে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যালোক সৃষ্টি করিত। মর্ম্মরপ্রাসাদ সহ রুসাদের উদ্যান এবং রাজধানীর উপকণ্ঠে অজ্‌জহরার প্রাসাদও বিশ্বের বিস্ময় ছিল। শুভ্র, রক্তিম এবং সবুজ মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত অজ্‌জহরার একটি কক্ষে ছিল কৃত্রিম ফোয়ারা। উহার জলধারা মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণময় প্রাণীর মুখ হইতে উৎসারিত হইত। পরিকল্পনার বিশালতায় এবং
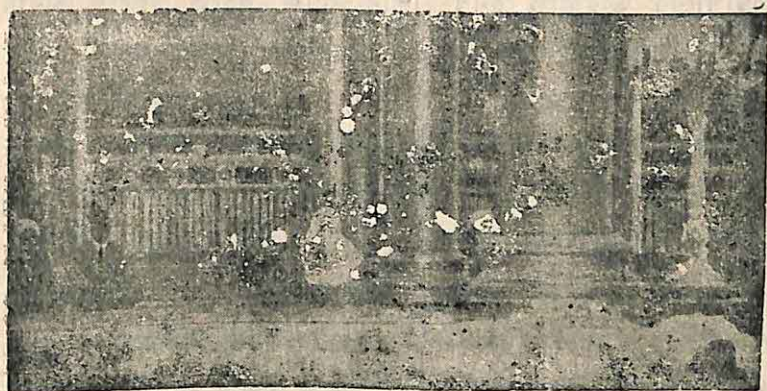
মদিনা শরিফের মসজিদের অন্তর্দৃশ্য

কারুকার্য্যের নৈপুণ্যে গ্রানাডার বিখ্যাত আল্‌হামরার প্রাসাদের তুলনা ছিল না। ইস্‌লামে মূর্ত্তি অঙ্কনের সমাদর নাই। তাই জটিল রেখাচিত্রের প্রলেপে ইহার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। আল্‌হামরার সিংহসদন ও বিচারকক্ষের কারুকার্য্যের তুলনা নাই।

বিশ্ব-সভ্যতায় আরবদের অবদান—আরবেরা গ্রীক এবং পারসিক সভ্যতার উত্তরাধিকারী ছিল। সুতরাং আরব সভ্যতার

সৃষ্টিতে এই দুই প্রাচীন সভ্যতার বিশেষ অবদান ছিল। এতদ্ব্যতীত সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে গ্রীক, পারসিক, ইহুদী ও ভারতীয় পণ্ডিতগণের আগমনে ও সহযোগিতায় এই সভ্যতা বিশেষ প্রাণবান্ হইয়া উঠিল। আরব সাহিত্যের স্বুবর্ণযুগ আরম্ভ হইল। ফার্সী, সংস্কৃত, হিব্রু এবং গ্রীক ভাষার অনেক গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হইল। এই অনুবাদকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **হুনাইন্-ইবন্ ইশাক্**। তিনি একজন চিকিৎসকের সহযোগী ছিলেন। গ্রীকভাষা শিক্ষার পর তিনি খলিফা কর্ত্তৃক সরকারী অনুবাদ-দপ্তর এবং গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত হন। তিনি গ্রীক হইতে সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করিতেন; তাঁহার সহকারীরা উহা সিরীয় ভাষা হইতে আরবীতে ভাষান্তরিত করিতেন। চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। এইরূপে গ্রীকেরা কয়েক শতাব্দীর সাধনায় যে দর্শন ও বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছিল, আরবগণ শীঘ্রই তাহা অধিগত করিয়া লইল। এতদ্ব্যতীত জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, ইতিহাস এবং ভূগোলেও তাহারা অসাধারণ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিল। আরবগণই হিন্দু-গণিতের দশমিক পদ্ধতি ও বীজগণিত এবং চীনাদের কাগজ নির্ম্মাণ প্রণালী ইউরোপে প্রচারিত করে। ইউরোপের চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতিতেও আরবদের দান ছিল অসামান্য। এক একজন আরব পণ্ডিত ছিলেন চলন্ত বিশ্বকোষ-স্বরূপ।

আবু সিনা ছিলেন একাধারে দার্শনিক, ভাষাতত্ত্ববিদ্, চিকিৎসক ও কবি। মাত্র দশ বৎসর বয়সেই তিনি সমগ্র কোরাণ মুখস্থ বলিতে পারিতেন। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি আমীরের চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হন। আমীর অকস্মাৎ রাজ্যচ্যুত

হইলে তিনি অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হন। সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দেশ হইতে তাঁহাকে দেশান্তরে ঘুরিতে হইয়াছে। অবশেষে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে এক সহৃদয় বন্ধুর সহিত তাঁহার দেখা হয়। বন্ধুটি তাঁহার জন্য একটি নিভৃত বাসস্থান ঠিক করিয়া দিলে তিনি তথায় একটি বিদ্যাপীঠ খুলিয়া বসেন। তথায় তিনি জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও তর্কশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। কিছুকাল পরে তিনি একজন আমীর কর্ত্তৃক ধৃত হন। অনেক চেষ্টায় তিনি বন্দীদশা হইতে পলায়ন করিয়া ইস্পাহানে চলিয়া যান। তথাকার শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় চিকিৎসকের পদ প্রদান করেন। তাঁহার রচিত **"ঔষধ শাস্ত্র"** এশিয়া ও ইউরোপ—এই উভয় মহাদেশেই সমানভাবে আদৃত হয়।

দার্শনিক জগতের সম্রাট্ ছিলেন **ইবন্ রুষ্‌দ**। তাঁহার দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি আরব সাহিত্যের অলঙ্কার। তাঁহার রচিত দার্শনিক গ্রন্থগুলি ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেককাল পর্য্যন্ত অধীত হইত।

ইবন্-খালদূন ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদের ইতিবৃত্ত ও রাজবংশের ইতিহাস রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। উত্তর আফ্রিকার টিউনিসিয়াতে তাঁহার জন্ম হয়। কর্ম্মক্ষেত্রে শত্রুর চক্রান্তে একবার তিনি তহবিল তছরূপের মিথ্যা দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। অভিযোগ হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি স্পেনে চলিয়া যান। গ্রানাডার খলিফা তাঁহাকে যথাযোগ্য সমাদর করেন। তৈমুর লঙ্-এর বিপক্ষেও তিনি একবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ হইল **বিশ্বের ইতিহাস**। **অল্-টবরীও বিশ্বের ইতিহাস, কোরাণের টীকা প্রভৃতি রচনা**

করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। জ্ঞান অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে তিনি পারস্য, ইরাক, সিরিয়া ও মিশর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি ৪০ বৎসর ধরিয়া রোজ চল্লিশ পৃষ্ঠা লিখিয়া গিয়াছেন।

মহাপণ্ডিত **অল্-বিরুনী**ও বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি গজনীর সুলতান মামুদের সভাসদ ছিলেন। তিনি মহাজ্ঞানী আবু সিনার সমসাময়িক। তাঁহাদের উভয়ের পত্রাবলী এখনও বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। অল্-বিরুনী রচিত **ভারতের ইতিহাস**ও একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

ইবন্-বটুটা ছিলেন প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ও লেখক। তিনি মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া ভারতে আসেন। তাঁহার "**সফরনামা**" গ্রন্থখানি জগৎ-বিখ্যাত। তিনি মহম্মদ তুঘলকের দরবারে কাজীর উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তথা হইতে তিনি চীন প্রভৃতি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া, শেষে দেশে ফিরিয়া যান। এইরূপে আরবদেশের পণ্ডিতেরা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সভ্যতার অগ্রগতিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শার্লেমেনের কাহিনী

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর জার্ম্মান জাতিদের যে নূতন রাজ্যগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার মধ্যে ফ্র্যাঙ্ক রাজ্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর কিয়দংশ জুড়িয়া ফ্র্যাঙ্ক রাজ্যের সীমানা ছিল। এই অঞ্চলের পূর্ব্ব নাম ছিল গল। রোমান সাধারণতন্ত্রের যুগে জুলিয়াস সীজার সর্ব্বপ্রথম গল-প্রদেশ অধিকার করিয়া এখানে রোমান সভ্যতার বিস্তারে সাহায্য করেন। তাহার পর হইতে কয়েক শতাব্দীর গল-প্রদেশ রোমের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিল বলিয়া গলবাসী বর্ব্বর ফ্র্যাঙ্কগণের মধ্যে রোমান সভ্যতার আদর্শ দৃঢ়-বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাই রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলেও ফ্র্যাঙ্ক প্রভৃতি জার্ম্মান জাতিদের পক্ষে রোমান সভ্যতার প্রভাব কাটাইয়া ওঠা সম্ভবপর হয় নাই। রোমান সভ্যতার প্রভাবাধীন কোন কোন দল খৃষ্টধর্ম্মও গ্রহণ করিয়াছিল। এইরূপ একটি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বংশের কন্যার সহিত ফ্র্যাঙ্করাজার বিবাহ হওয়ায় তিনিও খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সমস্ত ফ্র্যাঙ্ক প্রজাবৃন্দও ক্রমে ক্রমে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা লইতে আরম্ভ করে। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ফ্র্যাঙ্ক রাজগণ অতুল অধ্যবসায়ের সহিত বর্ব্বর জাতিসমূহের ভিতর এই ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন।

আরব অভিযাত্রী-দল যখন ইউরোপ বিজয়ের পরিকল্পনা লইয়া স্পেনে পদার্পণ করিলেন, তখন একজন ফ্র্যাঙ্ক সম্রাটের হস্তেই প্রথম আরব অভিযান সাফল্যের সহিত বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যিনি সে অভিযান প্রতিহত করিয়াছিলেন, শুধু ফ্র্যাঙ্ক জাতির ইতিহাসে নয়, সমস্ত ইউরোপের ইতিহাসেই তাঁহার নাম অমর হইয়া আছে। ইনি হইলেন **মহামতি চার্লস**। ফরাসী ভাষায় তাঁহার নাম **শার্লেমেন**। মহামতি চার্লস ছিলেন বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রশীদের সমসাময়িক। শার্লেমেনের জীবনীলেখক **আইনহার্ড** বলিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন দীর্ঘবাহু ও স্বাস্থ্যবান।

মহামতি শার্লেমেন

তাঁহার দীর্ঘ নাসিকা, উজ্জ্বল চক্ষু, সিংহের মত সাহস ও অমানুষিক শক্তির কথা অনেক লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। কথিত আছে যে, তিনি তরবারির এক আঘাতে অশ্বসহ আরোহীকে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিতেন। তিনি সর্ব্বদা ফ্র্যাঙ্কদের জাতীয় পোষাক পরিধান করিতেন। একটি অন্তর্বাস ও দীর্ঘ আঙ্‌রাখা বা বহির্বাস ছিল তাঁহার সাধারণ পরিচ্ছদ। উৎসব উপলক্ষে তাঁহার মাথায় উঠিত মুকুট, হাতে শোভা পাইত মণিমুক্তা খচিত

তরবারি এবং দেহে বহুমূল্য পোষাক। তিনি যেমন ছিলেন অগাধ শক্তির উৎস, কাজ করিবার ক্ষমতাও ছিল তাঁহার তেমনি অনন্যসাধারণ। প্রাতঃকালে পোষাক পরিতে পরিতে তিনি বিচারের কাজ শেষ করিতেন। রাজকর্মচারী ও অভিজাত-গণের সহিতও তিনি অতি সহজ ভাবে মিশিতেন। হাস্য পরিহাস ও কৌতুকেও তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তাঁহার কৌতূহলপ্রবৃত্তি ছিল প্রবল। প্রতিটি বিষয় গভীর ভাবে বুঝিবার জন্য তিনি লোকদিগকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেন।

মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে ফ্র্যাঙ্ক রাজ্যশাসনের ভার স্কন্ধে লইয়া এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে খৃষ্টের ক্রুশ সম্বল করিয়া তিনি নির্ভীক হৃদয়ে এই অন্ধকারময় ভবিষ্যতের পথে যাত্রা সুরু করিলেন।

তাঁহার সাম্রাজ্য—শার্লেমেন তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত করেন। পঞ্চাশটিরও অধিক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি উত্তর ইতালীর লম্বার্ডদিগকে পরাজিত করিয়া উক্ত স্থান তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। স্পেনের উমায়েদ বংশীয় আরব শাসনকর্ত্তাও পিরেনীজ পর্বতের দক্ষিণস্থ একটি জেলা শার্লেমেনকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

শার্লেমেনকে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল দুর্দ্ধর্ষ স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর অবশেষে তাহারা বশ্যতা স্বীকার করে। এইরূপে শার্লেমেনের সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমানা এল্‌ব নদ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। মধ্য ইউরোপে

তাঁহার সাম্রাজ্য ছিল বহুদূর বিস্তৃত। শার্লেমেনের সাম্রাজ্যের ভিতর ছিল বর্ত্তমান **ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, পশ্চিম জার্ম্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া** ও **যুগোশ্লোভিয়ার কিয়দংশ, উত্তর ইতালী** এবং **স্পেনের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চল**। মোট কথা, টিউটনিক ভাষাভাষীর অধিকাংশ লোকই তখন শার্লেমেনের রাজছত্রতলে আনীত হইয়াছিল।

শার্লেমেনের শৌর্য্যবীর্য্য সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার তিনি সৈন্যদল লইয়া কোন একটি রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শত্রুপক্ষীয় প্রহরীরা সুউচ্চ মিনারের উপর উঠিয়া তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। কেহ শঙ্কিত হৃদয়ে কয়েকজন বিচ্ছিন্ন ফ্র্যাঙ্কসৈন্য দেখিয়া ভাবিতেছিল, এই বুঝি শার্লেমেন আসিয়া পড়িলেন। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অন্য প্রহরীরা বলিয়া ওঠে, "না, ইহাদের সহিত চার্লস্ নাই। যখন দেখিবে দূরে মাঠ-ঘাট বর্শার ইস্পাত ফলকে ঝলসিয়া উঠিবে, তখন জানিও তিনি ঐ বাহিনীতে থাকিবেন।" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই দূরে দিগ্বলয়ে দেখা দিল একখণ্ড ঘন কাল মেঘের রেখা। দেখিতে দেখিতে ইস্পাতের ঝলকে আকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এবার সত্য সত্যই শার্লেমেন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

তাঁহার সারাদেহ ছিল ইস্পাতে আবৃত। হাতে ইস্পাতের বাহুবন্ধ, বুকে ইস্পাতের পাত, কাঁধের উপর ইস্পাতের ঢাল। বাম হাতে তীক্ষ্ণধার বর্শা, ডানহাতে তরবারি। জানু অবধি বর্ম্মাবৃত। তাঁহার ঘোড়ার রংও ছিল ইস্পাতের ন্যায় ঘন নীল।

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী হইলেও শার্লেমেন আরব বিজয়ীরূপেই ইউরোপে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

তাঁহার সেই বীরত্বের কাহিনী **রোল্যাণ্ডের** গীতিকাব্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। রোল্যাণ্ড ছিলেন শার্লেমেনের বিখ্যাত দ্বাদশ সভাসদের অন্যতম। কর্ডোভার খলিফার সহিত সংগ্রাম করিয়া সম্রাটের সৈন্যবাহিনী যখন স্পেন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, তখন রোল্যাণ্ড ক্ষুদ্র একদল সৈন্য লইয়া উহার পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করিতেছিলেন। সহসা এক গিরি-সঙ্কটের নিকট মুসলমান সৈন্যগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। নির্ভীক রোল্যাণ্ড বীরবিক্রমে শত্রু সৈন্যগণকে হত্যা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যদলও নিঃশেষ হইয়া আসিল। জয়ের সকল আশা ফুরাইয়া আসিলে তিনি শার্লেমেনের কাছে সাহায্য চাহিয়া শিঙ্গাধ্বনি করিলেন। কিন্তু সম্রাট্ তাঁহার সাহায্যার্থে আসিতে না আসিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুহস্তে রোল্যাণ্ডের মৃত্যু হইল।

শার্লমেনের ধর্ম্মানুরাগ—শার্লেমেন ছিলেন খৃষ্টধর্ম্মের গভীর অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। জার্ম্মানীর অর্দ্ধ-সভ্য স্যাক্সনগণ ও পূর্ব্ব ইউরোপের অনেক জাতি শার্লেমেনের তরবারির ভয়ে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বহুবার স্যাক্সনদের উপর অমানুষিক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছেন। একবার যুদ্ধের সময় তিনি নিরস্ত্র ৪৫০০ স্যাক্সনকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করেন। কখনও বা দুর্দ্দমনীয় স্যাক্সনদের তিনি দলবদ্ধভাবে দেশছাড়া করিয়া দিতেন। তাঁহার তরবারির মুখে বহু স্যাক্সন নগর শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু অবশেষে এই স্বাধীনতা-প্রিয়

স্যাক্সন জাতির কাছেও তিনি যীশুর শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি রাইন নদের অপর তীরে তাহাদের জন্য উপনিবেশ স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আগ্রহে সদ্যোবিজিত দেশগুলিতে দলে দলে খৃষ্টান সন্ন্যাসী ধর্ম্মপ্রচারের জন্য প্রেরিত হয়। তখন স্যাক্সনদের দেশে গীর্জ্জা, রাস্তাঘাট ও সেতু নির্ম্মিত হয়। এইরূপে স্যাক্সনগণ স্বাধীনতার বিনিময়ে পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতা লাভ করে।

শার্লেমেনের অভিষেক—তখন পশ্চিম ইউরোপের খৃষ্টান জগতের ধর্ম্মগুরু পোপ **তৃতীয় লিও** ছিলেন রোম নগরে। শত্রুর অত্যাচারে বিব্রত হইয়া লিও শার্লেমেনের সাহায্য প্রার্থনা করিলে শার্লেমেন স্বয়ং সসৈন্যে রোমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিচার করিয়া লিওকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিলেন। ইহা ৮০০ খৃষ্টাব্দের কথা। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে সমগ্র রোম নগর যীশু খৃষ্টের জন্মোৎসবে মত্ত হইয়া উঠিল।

ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী সেণ্ট্ পিটার্সের গীর্জ্জায় উপাসনা শেষ করিয়া সবিস্ময়ে দেখিল—পোপ লিও প্রার্থনারত শার্লেমেনের মাথায় রোমান সম্রাট্‌গণের সোনার মুকুট পরাইয়া দিয়া সেই শুভক্ষণেই তাঁহাকে 'সম্রাট্' উপাধিতে অভিহিত করিলেন। সমবেত নরনারী ও ফ্র্যাঙ্ক যোদ্ধাগণ উচ্চকণ্ঠে সম্রাটের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। পোপের নেতৃত্বে নতজানু হইয়া সকলে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। লোকে ভাবিল—পশ্চিম ইউরোপে বুঝি রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। শার্লেমেন, "রোমান-সম্রাট্" উপাধি লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাম্রাজ্যটিকে ফ্র্যাঙ্ক রাজ্য ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

শার্লেমেনের কৃতিত্ব—শার্লেমেনের দিগ্বিজয় ও খ্যাতি বিদেশী নরপতিগণের মনেও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিল। বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রশীদ শার্লেমেনকে একটি যন্ত্রচালিত ঘড়ি ও হস্তী উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। তদানীন্তন জগতের এই দুইজন শ্রেষ্ঠ সম্রাটের সখ্যতা একটি স্মরণীয় ঘটনা সন্দেহ নাই। শার্লেমেন মনে-প্রাণে ফ্র্যাঙ্ক হইলেও রোমের পূর্ব্বগৌরব পুনরূদ্ধার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। রাইন নদের তীরবর্ত্তী তাঁহার রাজধানী **আকেন** (Achen) বা **এইলা স্যাপেল**-এর নাম রাখা হইল "**নূতন রোম**"। তাঁহার আদেশে এককালের রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী **র‍্যাভেনা** হইতে নূতন রোম নির্ম্মাণের জন্য মোজাইক পাথর আসিল। উহা দ্বারা আকেন-এর বিশাল ও মনোরম রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা হইল। তাঁহার পরিকল্পিত গীর্জ্জাটিও ছিল অপরূপ সুন্দর।

শার্লেমেন লিখিতে জানিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা ছিল অত্যন্ত প্রবল। তিনি ল্যাটিন ভাষা জানিতেন এবং গ্রীক ভাষাও বুঝিতে পারিতেন। গভীর রাত্রিতে লিখিবার অভ্যাস করিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় তিনি বালিশের তলে লিখিবার সাজ-সরঞ্জাম রাখিয়া দিতেন। মুহূর্তমাত্র সময় অপব্যয় করা তিনি পছন্দ করিতেন না। তাই ভোজনের সময়ও তাঁহাকে ঐতিহাসিক কাহিনী পড়িয়া শুনান হইত। জ্ঞানপিপাসী শার্লেমেনের বিদ্যোৎসাহিতার অনেক উৎকৃষ্ট কাহিনী আছে। একদা রাজধানীর সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে গিয়া তিনি দেখিতে পান যে, দরিদ্র পরিবারের ছাত্রগণ গভীর মনোযোগের সহিত অধ্যয়নে রত; অথচ অভিজাত বংশীয় ছাত্রগণ লেখাপড়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

তিনি বংশগৌরব বিবেচনা না করিয়া গরীব ছাত্রদের প্রচুর পারিতোষিক ও উৎসাহ দেন এবং ধনীর সন্তানদের ভর্ৎসনা করেন।

শার্লেমেনের রাজসভায় ইউরোপের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাগম হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ইংলণ্ডের আল্‌কুইন। দিনেমারদের আক্রমণে দেশত্যাগ করিয়া তিনি ভবঘুরের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে শার্লেমেনের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। গুণগ্রাহী শার্লেমেন তাঁহাকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা সহকারে দরবারে স্থান দেন। তিনি সদ্যঃ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁহাকে দেন। আল্‌কুইন প্রশ্নোত্তরে ছাত্রদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

তাঁহার স্বীয় গুণে ও প্রতিভায় মধ্যযুগের বর্ব্বরতার অন্ধকারে শার্লেমেন সভ্যতার আলো জ্বালাইয়া রাখিলেন। সমসাময়িক চারণ কবি ও পরবর্ত্তী যুগের নরনারী তাঁহাকে মধ্যযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি এবং নূতন রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে তাঁহার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী জার্ম্মান শাসনকর্ত্তাগণ নিজদিগকে 'রোমান সম্রাট' বলিয়া মনে করিয়াছেন। খৃষ্টান জগতের কর্ত্তৃত্ব লইয়া এই সমস্ত 'রোমান সম্রাট' ও পোপদের মধ্যে কলহ ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসকে বহুবার কলঙ্কিত করিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

মধ্যযুগের ইউরোপীয় জীবন

সূচনা—শার্লেমেনের মৃত্যুর পর ইউরোপীয় ইতিহাসে আবার সঙ্কট ঘনাইয়া আসিল। তখন মেগিয়ার, দিনেমার ও নর্ম্মানদের আক্রমণে দিকে দিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কেন্দ্রীয় কোন রাষ্ট্রের কোথাও আধিপত্য না থাকায় এই সব লুণ্ঠনকারীদের হাতে সাধারণ শান্তিপ্রিয় প্রজাদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের অবধি ছিল না।

তাহারা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া সহায় সম্পত্তি সমস্ত কিছু লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী সামন্ত প্রভুদের আশ্রয় গ্রহণ করিত। ক্ষমতাবান রাজা ও অভিজাতগণ সেবার বিনিময়ে তাহাদের আশ্রয় দিত। ইহাদিগকে **ভিলেইন** ও **সার্ফ** বলা হইত। অভিজাতদের সকলেই ছিলেন ধনী জমিদার ও সামন্ত প্রভু। জীবিকার জন্য তাহাদের কোন পরিশ্রম করিতে হইত না। কারণ ভিলেইন ও সার্ফগণই জমি চাষ করা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের যত রকমের প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ করিয়া দিত।

জীবিকার জন্য পরিশ্রম না করিলেও অভিজাতগণ এক বিষয়ে রাজার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। রাজার আহ্বান আসিলে সামন্তদিগকে হাতিয়ার লইয়া রাজার পক্ষে যুদ্ধে যাইতে হইত। সামন্তগণও এই সেবার বিনিময়ে রাজার নিকট হইতে তাঁহাদের জমিদারীর মালিকানা পাইতেন।

মধ্যযুগে নাইটের শিক্ষানবিশী ও উপাধিলাভ—অন্য অভিজাত গৃহে শিক্ষানবিশী করিয়া অভিজাতদের জীবন সুরু হইত।

মধ্যযুগের প্রত্যেকটি সামন্ত-প্রভুর প্রাসাদ বা ক্যাসলে কয়েকজন অভিজাত বংশীয় বালক থাকিত। চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পেজরূপে (সাহায্যকারীরূপে) খাটিতে হইত। তাহার শিক্ষার ভার থাকিত সেই অভিজাত বংশের কোন মহিলার উপর। তাঁহার ফুটফরমাস খাটিতেই তাহার দিন কাটিয়া যাইত। তিনি পেজদিগকে ধার্ম্মিকদের নানা গল্প শুনাইতেন। ভাবী নাইট-জীবনে সভ্যতা, ভব্যতা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণের প্রয়োজন, সকল কিছুরই শিক্ষা তাঁহার নিকটে লইতে হইত।

পেজ-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্কোয়ার হওয়ার প্রতি। চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইলে তাহার এই পদোন্নতি হইত। সে তখন হইতে স্কোয়ার বলিয়া গণ্য হইত। স্কোয়ারের জীবনেও কিছুমাত্র ফুরসৎ ছিল না। অতি ভোরে শয্যা ত্যাগ করিবার পর হইতে সারাদিন তাহাকে ছায়ার ন্যায় সামন্ত প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হইত। তাঁহার বর্ম্ম পরিষ্কার করা ও অশ্বের তদারক করা হইতে আরম্ভ করিয়া আহারের সময় সেবা করা পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যাইত না। প্রভু যুদ্ধে গেলে তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া স্কোয়ারগণও সুসজ্জিত অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র সমেত প্রভুর নিকটে প্রস্তুত থাকিত।

এইরূপে শিক্ষানবিশী করিতে করিতে ২০।২১ বৎসর বয়সে উপযুক্ত বিবেচনা করিলে তাহাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হইত।

এই উপলক্ষ্যে সমারোহ করিয়া একটি উৎসব হইত। উৎসবটি ছিল যেমন দীর্ঘ, তেমনি গুরুগম্ভীর। স্নানের পর স্কোয়ারকে পবিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ ধবধবে সাদা পোষাক পরিতে হইত।

তাহার উপর লাল চাদর জড়াইবার প্রথা ছিল। শুভ্র পোষাক ছিল ভাবীযুগের পবিত্র জীবনের প্রতীক; আর এই লাল উড়ুণী স্মরণ করাইয়া দিত প্রভুর জন্য বিনাদ্বিধায় নিজ রক্তপাতের কথা। তাহার উপর পরিতে হইত একটি আটো-সাঁটো কালো কোট। ইহা ছিল মৃত্যুর প্রতীক—যে মৃত্যুর হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই।

পূর্ব রাত্রিতে ভাবী নাইটকে সারাক্ষণ গীর্জ্জার বেদীমূলে আরাধনা করিতে হইত। বেদীর উপর থাকিত তাহার ঢাল, তরবারি ও বর্শা। সেই গভীর নিস্তব্ধ গীর্জ্জায় তাহাকে একাকী উপাসনা করিতে হইত। সামান্য কয়েকটি মোমবাতির আলো থাকিত তাহার সম্বল।

প্রত্যূষের আলোয় যাজক আসিলে তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহাকে শপথ করিতে হইত—"বীরত্ব ও সম্মানের মর্য্যাদা জীবন দিয়াও রক্ষা করিব, ন্যায়ের রক্ষক ও অন্যায়ের শাসক হইব, নারীর মর্যাদা রক্ষা করিব, শরণাগত, দুর্ব্বল ও দুঃখতাপে ক্লিষ্ট ব্যক্তিদের জীবন দিয়াও উপকার করিব।"

ইতিমধ্যে স্কোয়ারের পরিবারের অন্য সকলে গীর্জ্জার প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। নাইট ও মহিলাগণ তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র গুছাইয়া দিতেন। এতক্ষণে নাইট হইবার শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হইল। সামন্ত প্রভুর সম্মুখে সে নতজানু হইয়া বসিলে তিনি তরবারি দ্বারা কাঁধে মৃদু আঘাত করিয়া বলিতেন, "ঈশ্বর ও সেণ্ট্ জর্জ্জের নামে তোমাকে নাইটের পদে বরণ করিলাম। তুমি যথাযোগ্য সাহস ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিও।"

নাইটরা ছিলেন শৌর্য্যে, বিশ্বস্ততায় ও সৌজন্যে অতুলনীয়। তাঁহারা প্রতিজ্ঞায় অটল থাকিতেন, নারী ও অনাথদের রক্ষায়

আগুয়ান হইতেন এবং ন্যায়ের নিমিত্ত প্রাণপাত করিতেও ইতস্ততঃ করিতেন না। নাইটদের এই গুণাবলীই ইংরাজীতে **শিভালরি** বলিয়া বিখ্যাত। মধ্যযুগের প্রথমে ইউরোপে যে বর্ব্বরতার ছাপ ছিল, নাইটপ্রথার মহৎ আদর্শের স্পর্শে তাহা অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া সভ্যরূপ ধারণ করিল।

'নাইট' উপাধি লাভের উৎসব

নাইটগণকে সর্ব্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত বলিয়া তাঁহারা সারাক্ষণ ভারী ইস্পাতের বর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া রাখিতেন। মাথা ও মুখ জুড়িয়া থাকিত ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ। তাহাতে দেখিবার ও নিশ্বাস প্রশ্বাস লইবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি ছিদ্র থাকিত মাত্র। হাতে থাকিত লম্বা বর্শা ও ঢাল। ক্যাসল হইতে যে অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহারা বাহির হইতেন, তাহারও সারাদেহ বর্ম্মে আবৃত থাকিত।

শিরস্ত্রাণে নাইটদের মস্তক আবৃত থাকিত বলিয়া তাহাদের চিনিবার উপায় ছিল না। সেজন্য একজন নাইট বিশেষরূপে

চিহ্নিত-ঢাল লইয়া যুদ্ধে নামিতেন। ঢাল দেখিয়া চেনা যাইত কে যুদ্ধ করিতেছেন।

মৃগয়া ও টুর্ণামেণ্ট—অভিজাত সামন্ত প্রভুদের ক্যাসল-এর চতুষ্পার্শ্বে মাইল-এর পর মাইল জুড়িয়া ছিল গভীর অরণ্য। হরিণ, শূকর, বন্যবরাহ ও অন্যান্য নানা জন্তু সেখানে অবাধে চলিয়া বেড়াইত। সেই সমস্ত পশু শিকার ছিল ক্যাসলবাসীদের এক মহা আনন্দের ব্যাপার।
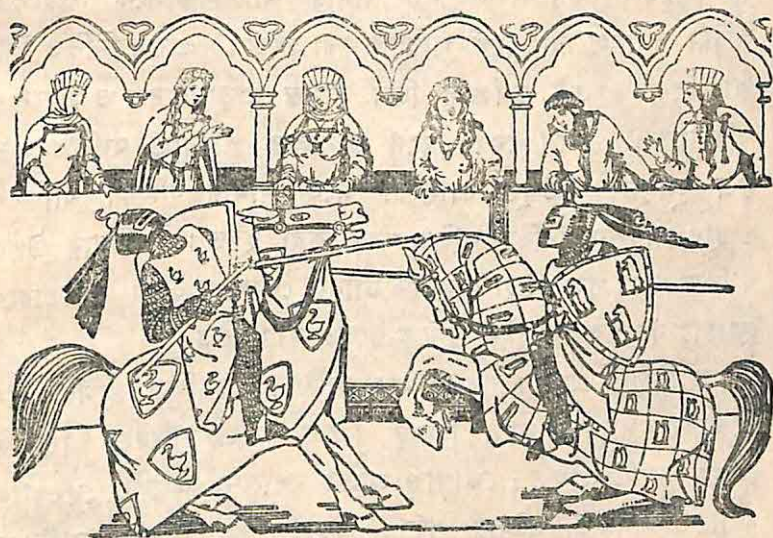
টুর্ণামেণ্ট প্রতিযোগিতা

পোষা বাজপাখী দ্বারা অন্যপাখী শিকার করাতেও তাহাদের খুব উৎসাহ ছিল। মহিলা ও পুরুষ নির্ব্বিশেষে এই খেলায় অংশ গ্রহণ করিতেন। তবে শিকারের অপেক্ষাও রোমাঞ্চকর ছিল টুর্ণামেণ্ট। যুদ্ধের অনুকরণে ক্যাসলবাসীদের শৌর্য্যবীর্য্য পরীক্ষার

জন্য উহা ছিল নকল যুদ্ধক্ষেত্র। যেদিন টুর্ণামেণ্ট বসিবে তাহার কয়েক মাস পূর্বেই দিকে দিকে দূত পাঠাইয়া টুর্ণামেণ্টের তারিখ ঘোষণা করা হইত। যে কোন লোক সেই টুর্ণামেণ্টে যোগদান করিতে পারিত।

ম্যানর বা খামার বাটিকা—অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণতঃ **খামার বাটিকায়** বা **ম্যানরে** বাস করিতেন। ইহাতে থাকিত প্রকাণ্ড একটি ভোজনাগার ও উহাকে ঘিরিয়া গুটিকয়েক **শয়ন কক্ষ**। কখনো কখনো খামার বাটিকাগুলিকে সুরক্ষিত করিয়া ক্যাসল বা দুর্গে পরিণত করা হইত। প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত এই দুর্গগুলি ছিল সামন্ত প্রভুদের দম্ভ ও ঐশ্বর্যে র পরিচায়ক। কোন কোন দুর্গে জানালার পরিবর্ত্তে থাকিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘুলঘুলি। উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে খামার বাটিকা থাকিলে তাহার চারিপাশ ঘিরিয়া পরিখা খনন করা হইত। পরিখার উপর থাকিত টানা পুল। উহা ইচ্ছামত টানিয়া তোলা যাইত। দুর্গতোরণে লোহার ঝাঁপ-কপাট দিয়া দুর্গকে দুর্ভেদ্য করা হইত।

শান্তিপূর্ণ গ্রামাঞ্চলের খামার বাটিকায় সুরক্ষিত দুর্গের কোন বন্দোবস্ত থাকিত না। বিরাট্ কাঠের ঘরের ভিতরে স্তিমিত মোমের বাতি জ্বলিত ; কোথাও জ্বলিত মশালের আলো, দেওয়ালে ঝুলানো থাকিত বুটিদার পর্দ্দা। ইহাই ছিল, খামার বাটিকার ভিতরের দৃশ্য।

অভিজাত মাত্রেই ছিলেন ভোজনবিলাসী। অতি সামান্য কারণেই তখন মহোৎসবের আয়োজন হইত। মহোৎসবের সাজ-সজ্জার চটকে চোখ ধাঁধাইয়া নাইট ও মহিলাগণ আনন্দ উল্লাসে মত্ত হইতেন। চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় কিছুই বাদ থাকিত না।
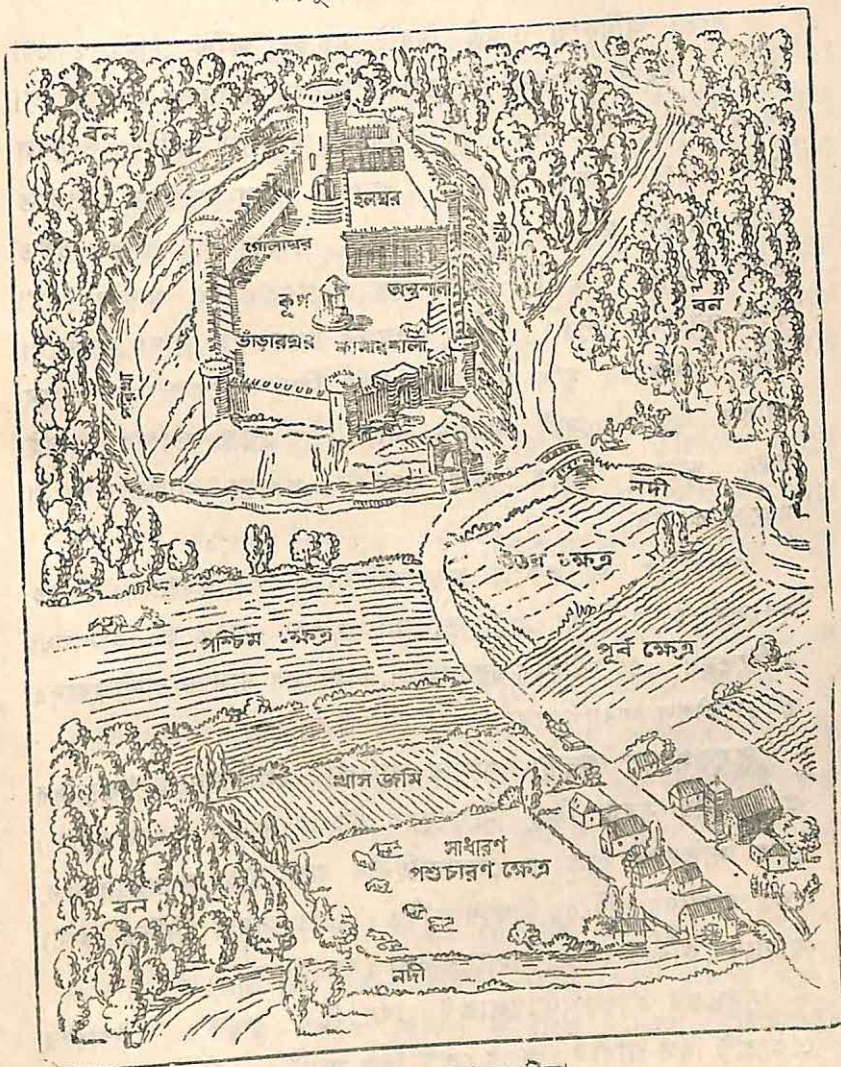
ম্যানর বা খামার বাটিকা

ঘরের অগ্নিকুণ্ডে একটি বিরাট্ গাছের গুঁড়ি ঠেলিয়া দেওয়া হইত। উহার আগুনে খৃষ্টপূর্ব্বের ভোজের রাত্রিতে সকলে গা গরম করিয়া লইতেন। একটি বিরাট্ গামলায় করিয়া আপেল ফল পরিবেষণ করা হইত। আপেল ফল খাইতে খাইতে একে অন্যের স্বাস্থ্য পান করিতেন। তাহার পর আরম্ভ হইত প্রকৃত ভোজ। একটা গোটা বন্য বরাহের মাথা আনিয়া রাখা হইত টেবিলের উপর। রূপার পরাতের উপর সেই মাথা সাজানো হইত। শূকরের মুখে থাকিত একটি সিদ্ধ আপেল ও কানে থাকিত রোজ মেরী ফলের মালা। হয়ত তাহার পরেই দুজন ভৃত্যের হাতে অন্য একটি পরাতে আসিত গোটা ময়ূরের কাবাব।

ভোজনের পর সকলে হাস্য পরিহাসে লিপ্ত হইতেন। কেহ সকলের কাছে গিয়া ঠাট্টা তামাসা করিয়া সকলকে হাসাইয়া মারিতেন। এই ভাঁড়ের রহস্যালাপ, চারণদের গান ও বাজীকরদের ক্রীড়াকৌশল অভ্যাগতদের চিত্ত বিনোদন করিত।

কৃষকগণের অবস্থা—খামার বাটিকার লোকজনকে নিজেদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু নিজেদেরই উৎপন্ন করিয়া লইতে হইত। কেহ অভিজাত প্রভু ও সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিত, কেহ তাহাদের পরিধেয় নির্ম্মাণ করিত। এত সমস্ত বিভিন্ন কার্য্য যাহাদের করিতে হইত, তাহাদের বলা হইত কৃষক।

সমাজের অধিকাংশ লোকই তখন ছিল কৃষক। ইহাদের একশ্রেণী ছিল স্বাধীন; অপর শ্রেণী ছিল **সার্ফ** বা **ভূমিদাস**।

সার্ফ বা ভূমিদাস—সার্ফগণকে খাটুনির জন্য কোন পারিশ্রমিক দিতে হইত না। তাহার পরিবর্ত্তে ভরণ-পোষণের নিমিত্ত

তাহাদের ছোট দুই একফালি জমি দেওয়া হইত। এই জমিটুকুর চাষের বদলে সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন করিয়া তাহাকে প্রভুর জমিতে বেগার দিতে হইত। পালপার্ব্বণের সময় নিজের জমির ফসল কিংবা হাঁস-মুরগীও প্রভুকে ভেট দিতে হইত।

আর এক শ্রেণীর কৃষক ছিল স্বাধীন। সামন্তগণ তাহাদিগকে বিপদে-আপদে রক্ষা করিতেন; তাহার বিনিময়ে কৃষকগণ প্রভুকে ক্ষেত্রের ফসল দিত ও তাঁহার হুকুম মত নানা কাজকর্ম্ম করিয়া দিত।

নামে স্বাধীন হইলেও কার্য্যতঃ স্বাধীন বলিতে তাহাদের কিছুই ছিল না। প্রভুর হুকুম ব্যতীত ম্যানর ছাড়িয়া কোথাও যাইবার অধিকার তাহাদের ছিল না। কেহ বিবাহ করিতে চাহিলেও প্রভুর মত লইতে হইত।

মধ্যযুগের ইউরোপের কৃষকগণ উন্নত কৃষির বিষয় তেমন কিছুই জানিত না। খামার বাটির উর্ব্বর জমিগুলি তিনভাগে বিভক্ত করা থাকিত। শীতকালে এক অংশ চাষ করা হইত; বসন্তে হইত দ্বিতীয় অংশ এবং তৃতীয় অংশটি অনাবাদী পড়িয়া থাকিত। প্রত্যেকটি ক্ষেত আবার নানা ছোট ছোট বিভাগে ভাগ করা থাকিত। ঐগুলি ছিল কৃষকদের অংশের।

স্বাধীন কৃষকেরা ক্যাসল-এর চৌহদ্দীর বাহিরে বাস করিত। তাহাদের ঘরগুলি ছিল এক-কুঠরীর। খড়ের বেড়া থাকিত ঘরে; মেঝে ছিল মাটির, আর কোনও কুঠরীতে থাকিত ছোট একটি জানালা।

কৃষকদের পরিধানে থাকিত দড়ির বেল্ট দিয়া বাঁধা মোটা জামা-কাপড়। নিজেদের ভেড়ার লোম হইতে তাহাদের কাপড় বুনিয়া

পরিতে হইত। সারা গায়ে কাপড় জড়াইয়া রাখিয়া তাহারা শীতের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিত। তাহারা জুতা পরিতে পারিত না। তাহার বদলে পায়ের তলায় কাপড় জড়াইয়া একটি কাঠের মত জিনিষ ব্যবহার করিত।

পোষাকের ন্যায় তাহাদের খাদ্যও ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট। ডালের মত পরিজ, সুপ, শূকরের লোনা মাংস, মাছ আর কালো রুটি ছিল তাহাদের প্রধান খাদ্য। অধিকাংশ দিন তাহাদের নিরামিষ শাক-চচ্চড়ি খাইয়াই দিন কাটাইতে হইত।

গ্রামবাসীদের যাহা প্রয়োজন, তাহার প্রায় সমস্তই উৎপন্ন করিতে হইত খামার বাড়ীতে। শুধুমাত্র লবণ সংগ্রহ ছাড়া আর বাহিরের পৃথিবীর সহিত তাহাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। কৃষকদের সম্পত্তির মধ্যে ছিল কয়েকটি শূকর, একটি দুগ্ধবতী গাভী, গুটিকয়েক বলদ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একটি ঘোড়া।

গ্রামে গীর্জ্জা থাকিত। উহার পুরোহিত ছিলেন কৃষকদেরই ন্যায় দরিদ্র। তিনি সামান্য লেখাপড়া জানিতেন। কৃষকদের নিরানন্দ জীবনে গ্রামের গীর্জ্জা কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য আনিয়া দিত, সন্দেহ নাই।

সহরবাসীর জীবন—বর্ব্বরগণের আক্রমণের পরে রোমান আমলের নগরগুলি অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। লোকজন ক্যাসল ও ম্যানর-এর চতুষ্পার্শে ভিড় করিয়া থাকিত। ক্রমে যাতায়াতের পথে, ভাল রাস্তার মোড়ে মোড়ে কিংবা নদীর তীরে ছোট ছোট গঞ্জ গড়িয়া ওঠে। ভ্রাম্যমাণ সওদাগরেরা ঐ সকল গঞ্জে বসিয়া কেনাবেচা করিতে আরম্ভ করে। কালক্রমে এই সকল গঞ্জ মধ্যযুগের নগরে রূপান্তরিত হইয়া ওঠে। রোমান যুগের

নগরের তুলনায় এ নগরগুলি আয়তনে ছিল ক্ষুদ্র। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের লোকসংখ্যা কিছু কম ছিল না। নগরগুলির চারপাশ বেষ্টন করিয়া থাকিত উচু পাথরের দেয়াল। বড় বড় গেট দিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে হইত। সে সকল গেটে প্রহরিগণ দিবারাত্র পাহারা দিত। নগরের পথঘাট ছিল একান্ত সঙ্কীর্ণ। পথের পাশেই ছিল উন্মুক্ত নর্দ্দমা। উহার দুর্গন্ধে ও পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা স্তূপে চলাচল করা দুঃসাধ্য ছিল।
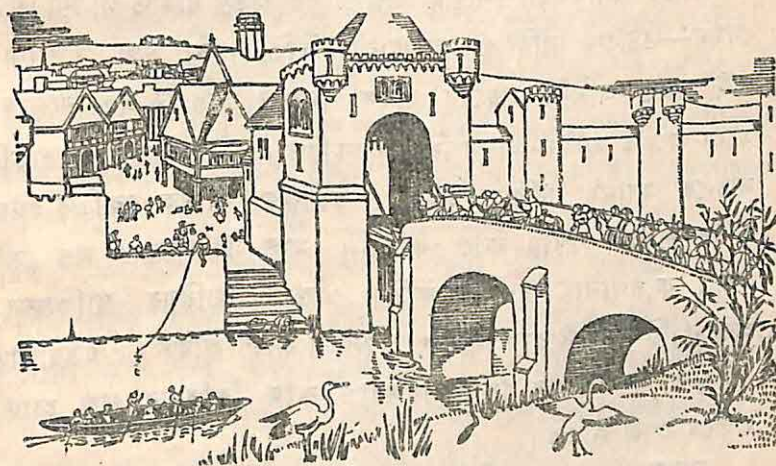
মধ্যযুগের সহর

কুটির ও কাঠের ঘরের বস্তী নগরের সৌন্দর্য্যকে কলঙ্কিত করিত। নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল না। এতদ্ব্যতীত চোর এবং দস্যুর উৎপাত, রাস্তায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও খুন-জখম ইত্যাদি মধ্যযুগের সহরের প্রায় দৈনন্দিন ঘটনা ছিল। রাত্রিকালে অনেক সহরে পাহারাদারেরা টহল দিত। সহরে পান্থশালা, বাজার,

মেলা প্রভৃতি থাকার জন্য নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

নগরের শাসন পরিচালনা করিবার জন্য **অল্ডারম্যান ও মেয়র** ছিলেন। তাঁহারা জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। সহরের বণিকদের মধ্যেও অনেকে ছিলেন ধনকুবের। বণিকদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য অনেক বণিক-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেক বণিকই ইহার সভ্য হইতে পারিতেন। কালক্রমে কারিগরী শিল্পের জন্যও বহু স্বতন্ত্র সমিতি গড়িয়া ওঠে, যেমন—তন্তুবায় সমিতি, কর্ম্মকার সমিতি, দর্জ্জি সঙ্ঘ ইত্যাদি। এই সমস্ত সমিতি সহরের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে অনেক আইন-কানুন বিধিবদ্ধ করিত। সেই আইন প্রত্যেকটি সভ্যকে মানিয়া চলিতে হইত। কয়েকজন শ্রমিক একত্রিত হইয়া কুটির-শিল্পের পন্থায় কাজ করিত। মাল উৎপাদনের জন্য সেই সকল কারখানায় একজন করিয়া ওস্তাদ কারিগর থাকিতেন। অন্য কারিগররা তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিত। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক কারখানায় শিক্ষানবিশরাও কাজ শিখিবার জন্য হাতে-কলমে কাজ করিত।

মধ্যযুগের গোড়ার দিকে অনেক নগর সামন্ত প্রভুদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেজন্য নগরের অধিবাসীরাও সকলেই সামন্ত প্রভুর অধীন ছিল। ধন-সম্পত্তি ও প্রাণের নিরাপত্তার বিনিময়ে তাহারা প্রভুকে কর দিতে বাধ্য ছিল। প্রভুর ইচ্ছাই ছিল আইন এবং তাঁহার মনোনীত লোক নগরের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন।

এই সকল অভিজাত প্রভুরা নগরের ব্যবসা-বাণিজ্যে অযথা হস্তক্ষেপ করিতেন। ব্যবসায়ীদের চলাফেরাতেও প্রতিপদে তাঁহারা

বাধা দিতেন। জমির শেষ সীমায় প্রভুরা টোল (Toll) বা মাশুল বসাইয়া দিতেন। নগর হইতে বাহিরে যাইতে হইলে, কিংবা ভিতরে আসিতে হইলেই ঐ-সব টোলে শুল্ক দিতে হইত। নগরের অধিবাসীরা বহুভাবে এই অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছিল। অবশেষে সুযোগও মিলিয়া গেল।

অধিকাংশ অভিজাত প্রভুর হাতে নগদ টাকা খুব কম ছিল। এদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিলাসের ব্যয় বাড়িল। দেশের অর্থ ছিল বণিক ও সওদাগরের সিন্দুকে সঞ্চিত। অর্থের প্রয়োজন পড়িলেই সামন্ত প্রভুরা নগরের শ্রেষ্ঠীর বা বণিকের কাছে হাত পাতিতেন। ক্রমে তাহাদের টাকা ধার দিবার সময়ে বণিকগোষ্ঠী নিজেদের স্বাধীনতার সনদ আদায় করিয়া লইত। সেই সনদের চুক্তি অনুসারে তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত নগর শাসনের আইন-কানুন ও মুদ্রা প্রচলনের স্বাধীনতা লাভ করিত। যেখানে কেন্দ্রীয় রাজশক্তি ছিল দুর্ব্বল, যেমন—উত্তর ইতালী, পশ্চিম জার্ম্মানী ও **নেদারল্যাণ্ডস্**—সেখানে এই জাতীয় সহরগুলি প্রায় গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলির মত স্বাধীন হইয়া উঠিল। নিজেরা টাকা দিত বলিয়া নগরগুলির শাসনের চাবিকাঠিটিও কিন্তু বণিকগোষ্ঠী ও ধনিকদের হাতেই রহিয়া গেল।

পুরোহিতদের জীবন—মধ্যযুগের সমাজে পুরোহিতদের স্থান ছিল অতিশয় উচ্চে এবং জনসাধারণ তাঁহাদিগকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। পুরোহিত ব্যতীত সমাজে আর শিক্ষিত ব্যক্তি ছিল না বলিলেই হয়। সাধারণতঃ তাঁহারা অবিবাহিত থাকিতেন; কারণ তাহা না হইলে তাঁহারা তাহাদের সমস্ত জীবন ধর্ম্মকর্ম্মে উৎসর্গ করিবার সুযোগ পাইতেন না।

পুরোহিতদের মধ্যে কেহ কেহ পল্লী অঞ্চলে বাস করিতেন এবং গ্রামবাসীদের উপাসনায় সহায়তা করিতেন। এই শ্রেণীর পুরোহিত-দের অধিকর্তা ছিলেন বিশপ। তিনি একটি ডায়োসিস বা জেলার ধর্ম্মকর্ম্মের অধ্যক্ষ ছিলেন। সাধারণ পুরোহিতেরা একত্রে মঠে বাস করিতেন। সন্ন্যাসিনীদের জন্য‌ও স্বতন্ত্র মঠ ছিল। প্রত্যেক সন্ন্যাসী সঙ্ঘকে একজন মঠাধ্যক্ষের অধীনে বাস করিতে হইত; সন্ন্যাসিনীগণ বাস করিতেন এক মঠধারিণীর কর্তৃত্বাধীনে। কেহ সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতে চাহিলে আগে দুই এক বছর তাহাকে কোন মঠে জীবন কাটাইতে হইত। ঐ সময়ের পরেও যদি সে মঠে থাকিতে ইচ্ছা করিত, তখন তাহাকে অবশিষ্ট জীবন সেই মঠের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত। তাহার নিজস্ব বলিতে কোনও কিছুই থাকিত না। পড়িবার বই, লিখিবার কলম, কিছুই তাহার নিজস্ব রাখিবার অধিকার ছিল না। কোন কোন পুরোহিত এবং বিশপ দারিদ্র্যের ব্রত পরিত্যাগ করিয়া লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে দ্বিধা করিতেন না।

একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের চারিদিকে ঘিরিয়া থাকিত সন্ন্যাসীদের ঘর। তদানীন্তন মানুষের বিলাস আড়ম্বরের তুলনায় মঠের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সরল। মোটা কাপড়ের চাদর জড়ানো থাকিত তাহাদের গায়ে। দড়ি দিয়া কোমরে তাহা শক্ত করিয়া বাঁধা থাকিত। অতি সাধারণ খাদ্য তাহাদের খাইতে দেওয়া হইত। খাইবার সময় কেহ কথা বলিতে পারিত না। সূর্য্য উঠিবার বহু পূর্ব্বে মঠে উপাসনাগারে গিয়া তাহারা ভজনা আরম্ভ করিত। দিনের মধ্যে কয়েকবার ঘণ্টা বাজাইয়া এইরূপে উপাসনা করা হইত। মঠে সকলকেই খাটিতে হইত

কাজেরও কোন অভাব ছিল না। নিজেদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই তাহারা নিজেরা প্রস্তুত করিত। মঠের সীমানার বাহিরে জমিতে শস্য চাষ করা হইত। মঠের বাগানে উৎপন্ন হইত শাকসব্জী ও ঔষধের লতাগুল্ম ইত্যাদি। তাছাড়া ছিল পশুপালন, রান্নাবান্না, কাপড় ধোয়া ও মঠ পরিষ্কার করা।

মঠগুলি নগরের হৈ-চৈ হইতে দূরে থাকিলেও মধ্যযুগের জীবনের উপর তাহাদের গভীর প্রভাব ছিল। মঠবাসীরা চতুষ্পার্শ্বের ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিয়া সাহায্য করিত, শরণার্থীকে দিত আশ্রয়, অসুস্থকে করিত চিকিৎসা।

মঠগুলি মধ্যযুগের সভ্যতার কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেখানকার বিদ্যালয়ে সন্ন্যাসিগণ ছাত্রদের লাতিন ভাষা শিখিতে পড়িতে শিখাইতেন। সন্ন্যাসিগণ যাহা জানিতেন, হাসিমুখে ছাত্রদের সে-বিদ্যা শিক্ষা দিতে কার্পণ্য করিতেন না।

সেকালে এখনকার মত নগরে নগরে এত হোটেল ছিল না। ভ্রমণকারীদের বিশ্রামের জন্য প্রতি মঠে অতিথিদের জন্য ঘর আলাদা করিয়া রাখা হইত। পাথকগণ সেখানে ক্ষুধায় অন্ন ও রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য শয্যা পাইয়া ধন্য হইত।

শিক্ষা বিস্তারের কাজে তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দান হইল পুঁথি রচনা। মধ্যযুগে যখন কাগজ আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন চামড়ার উপর খুদিয়া খুদিয়া বহু পরিশ্রমে সন্ন্যাসিগণ পুঁথি রচনা করিতেন। এইরূপ এক একটি পুঁথি লিখিতে প্রচুর সময় অতিবাহিত হইত।

নিজেরা লেখাপড়া শিখিয়া উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, মঠের অনেক সন্ন্যাসী চারিপাশের গ্রামের অজ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে

গিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেন। ইঁহারা ব্রাদার বা ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত হইতেন।

কালক্রমে অনেক মঠের জীবন জটিল ও আড়ম্বরপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সন্ন্যাসীদের অনেকে বিলাসী, কর্ম্মবিমুখ এবং চরিত্রহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু এত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও বহু মঠ বিদ্যাচর্চ্চার জন্য ইউরোপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়—মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপে শিক্ষার ক্ষেত্রে যেন নূতন প্রাণসঞ্চার হইল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অধ্যাপক এবং বিদ্যার্থিগণের সমাবেশেই গড়িয়া উঠিল। কারখানার শিক্ষানবিশগণের মত বিদ্যার্থিগণও প্রায় ছয় বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়া শেষ উপাধি গ্রহণ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিত। প্যারিস্, অক্সফোর্ড এবং বোলোনার মত প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিখ্যাত অধ্যাপকদের কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের পাদমূলে বসিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিবার জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে অগণিত ছাত্র সেখানে আসিত। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের এবং বিভিন্ন সমাজের ছাত্র আসিত বলিয়া এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নাম হইয়াছিল বিশ্ববিদ্যালয়। অনেক সময় বিদ্যার্থিগণ কোন বিশেষ বিভাগে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য এক শিক্ষাকেন্দ্র হইতে অন্য শিক্ষাকেন্দ্রে গমন করিত। বিদ্যার্থিগণের জন্য বহু শয্যাবিশিষ্ট শয়নগৃহ ছিল, লাইব্রেরীটি ছিল ছোট, গ্রন্থের সংখ্যাও ছিল খুব কম। অধ্যাপক সাধারণতঃ বক্তৃতা ও শ্রুতলিপি দিতেন, বিদ্যার্থিগণকে উহা কণ্ঠস্থ করিয়া শুনাইতে হইত। অনেক সময় কোন বিশেষ অঞ্চলের বিদ্যার্থীরা মিলিত হইয়া ক্লাব ও সম্মিলনীও গঠন করিত। বিদ্যার্থিগণের ছিল উগ্র একতাবোধ—

তাহারা একই রকমের গাউন বা পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিত এবং নিজের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তাহারা যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিত। কোন কোন সময়ে গাউন পরিহিত বিদ্যার্থিগণের সঙ্গে নগরবাসীদের সংঘর্ষ হইত। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে **সেলের্ণো** ছিল চিকিৎসা-বিদ্যার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। **বোলোনা** আইন শিক্ষার জন্য এবং **প্যারিস** ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্য আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল **অক্সফোর্ড** এবং **কেম্বিজ**। ইহা প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মেডেল

মধ্যযুগের সভ্যতা—মধ্যযুগের পণ্ডিতগণ জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম দেওয়া হইয়াছে **স্কুল-মেন** (school-men) বা **স্কলাষ্টিক্স** (scholastics)। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **এবিলার্ড, এলবার্ট ম্যাগনাস, টমাস একুইনাস** এবং **রোজার বেকন**।

এবিলার্ড ছিলেন ব্রিটানির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি প্যারিসের নোটর-ডেম ক্যাথেড্রাল স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা

করিয়া বাইশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নিজেই শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী হন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া নোটর-ডেমের ক্যাথেড্রাল স্কুলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদায় উন্নীত হয়। তাঁহার একখানি গ্রন্থের নাম "হাঁ এবং না" (sic et non)। কোন একটি বিষয়ের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যাহা কিছু পণ্ডিতেরা লিখিয়াছেন, তাহা তিনি দুই ভাগে সাজাইয়া বিদ্যার্থীদিগকে বুঝাইয়া দিতেন।

এলবার্ট ম্যাগনাস এবং তাঁহার বিখ্যাত শিষ্য টমাস একুইনাসও মধ্যযুগীয় পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহারা জ্ঞানযোগী হইলেও ভক্তিমার্গকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। একুইনাস বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া অবশেষে পরলোক গমন করেন। তাঁহার রচিত আঠারখানি গ্রন্থের মধ্যে **"সাম্মা থিয়োলজিকা"** গ্রন্থখানি মধ্যযুগীয় ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্যার বিশ্বকোষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শুধু ধর্ম্ম ও দর্শনে নহে, মধ্যযুগের পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান সম্বন্ধেও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে ইংলণ্ডের চিন্তাবীর **রোজার বেকন** বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি অক্সফোর্ডে বিদ্যালাভ করিয়া প্যারিসে অধ্যাপনা সুরু করেন। তাঁহার রচিত **"আলোক"** পুস্তকটি প্রায় দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন স্থলে পঠিত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় মধ্যযুগীয় বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণাগারে হাতে কলমে পরীক্ষা না করিয়া লাইব্রেরীতে বসিয়াই বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতেন।

মধ্যযুগে ইউরোপের আন্তর্জ্জাতিক ভাষা ছিল লাটিন। ক্রমে ক্রমে লাটিনের প্রাধান্যের যুগ শেষ হইল এবং বিভিন্ন জাতীয়

ভাষায় সাহিত্য রচিত হইতে লাগিল। রাজা আর্থার, রবিনহুড, রোলাণ্ড প্রভৃতি বীরকে কেন্দ্র করিয়া অজস্র গীতিকাব্য এবং রোমান্টিক সাহিত্য রচিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত কাব্য ও গাথায় সামন্ত যুগের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। ফ্রান্সের ত্রুবেদুর নামক চারণ-কবিদের গীতিকা বাঁশী এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র সহকারে সামন্ত সভায় এবং অন্যত্র গীত হইত। জার্ম্মানীর **মিন্নে** গায়কদের (জার্ম্মান মিন্নে=প্রেম) গীতিকাও খুব জনপ্রিয় ছিল। এই সমস্ত গীতিকা এবং সাহিত্য জাতীয় ভাষায় রচিত হওয়ায় ইহাদের সমাদর বাড়িয়াই চলিল। ইহাদের মধ্যে রাজা **আর্থারের** গল্প খুব জনপ্রিয় ছিল। কথিত আছে যে, আর্থার ছিলেন বৃটেনের একজন রাজা। তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীতে অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজা আর্থার এবং তাঁহার গোল টেবিলের নাইটগণের চমকপ্রদ কাহিনী বহু শতাব্দী ধরিয়া কাব্য ও সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ছিল। রাজা আর্থারের মত **রবিনহুডের কাহিনী** অবলম্বন করিয়াও বহু গীতিকাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে। শেরউড্ বনের অধিবাসী রবিনহুড ও তাঁহার আমোদপ্রিয় সহকর্ম্মিগণ ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের নির্ম্মম শত্রু এবং দুর্ব্বলের সেবক। তাঁহাদের বীরত্ব, সৌজন্য, উদারতা এবং সরল ব্যবহারের কাহিনী লোকমুখে শত শত বৎসর পর্য্যন্ত গীত হইয়াছে। **রোলাণ্ড**-গীতিকার কাহিনী পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা ফরাসী জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের প্রথম সুস্পষ্ট চিত্র।

ইতালীর অমর কবি **দান্তের** নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি **ডিভাইন কমেডি** নামক কাব্য রচনা করিয়া ইতালীর একটি

প্রাদেশিক ভাষাকে জাতীয় ভাষায় পরিণত করেন। তাঁহার কিছু-কাল পরে ইংরেজ কবি **চসার ক্যাণ্টারবেরী কাহিনী** রচনা করিয়া এই লাভ করিয়াছেন। এই কাহিনীতে মধ্যযুগের অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত রন্প্রদায়ের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

দান্তে

মধ্যযুগের শেষ দিকে যেমন দেশে দেশে জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ ঘটিতে থাকে, তেমনি স্থাপত্য-শিল্পেও এক নূতন জীবনের সঞ্চার হয়। প্রাচীন লেখকেরা এই স্থাপত্য-শিল্পের নাম দিয়াছেন **"গথিক"**। কিন্তু ইহার সহিত বর্ব্বর জার্ম্মান আক্রমণকারী গথদের কোনও সম্পর্ক নাই। যে সমস্ত গীর্জ্জা এবং ক্যাথেড্রাল এই পদ্ধতিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদের সহিত গ্রীক ও রোমান পদ্ধতির কোন মিল ছিল না। সেইজন্য গোঁড়া সমালোচকগণ এই পদ্ধতিকে অন্যায়ভাবে বর্ব্বর গথ আক্রমণকারীদের নামের সহিত জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। গথিক স্থাপত্য-শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার সুদীর্ঘ চূড়া। ইহা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে হইতে যেন উর্দ্ধাকাশে অসীমের পানে চলিয়া গিয়াছে। এই স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন **চার্টার, রীম্‌স্‌, প্যারিস্‌,** ক্যাণ্টারবেরী, কোলোন এবং **মিলানের** ক্যাথেড্রালগুলি।

ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধ—মধ্যযুগের ভক্ত খৃষ্টানগণ ঋষিদের পবিত্র সমাধিস্থান দেখিতে যাইতেন। তাঁহাদের নিকট সকল তীর্থের সেরা ছিল যীশুর জন্মস্থান **জেরুজালেম**। কিন্তু সেই পবিত্র সহরটি বহুকাল মুসলমানদের শাসনাধীনে ছিল। জেরুজালেমের মুক্তির জন্য খৃষ্টান জগতের ধর্ম্মগুরু **দ্বিতীয় আর্ব্বান** ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সন্ন্যাসী পিটার আবেগময়ী ভাষায় ইউরোপের সকলকে
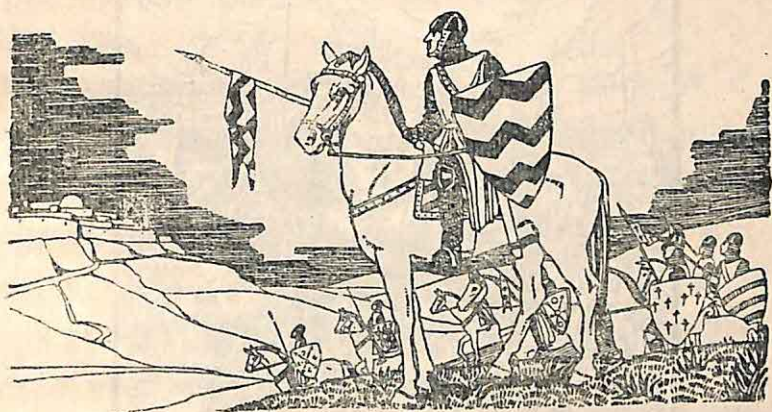
ক্রুসেডের সেনাদল

রণোন্মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। কৃষক তাহার লাঙ্গল ফেলিয়া চলিল, মিস্ত্রি তাহার যন্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিল, বণিকেরা দোকান পরিত্যাগ করিয়া প্যালেষ্টাইনের ধর্ম্মযুদ্ধে রওনা হইল। এইরূপে দলে দলে, কাতারে কাতারে হাজার হাজার নরনারী মর্ত্ত্যের স্বর্গ জেরুজালেমের দিকে রওনা হইল। রাস্তার কষ্টে এবং তুর্কীদের আক্রমণে ইহাদের অধিকাংশই বিধ্বস্ত হইল। এই ধর্ম্মযুদ্ধের আহ্বানে ইউরোপের ক্ষাত্রশক্তিও জাগরিত হইয়াছিল। এই সঙ্ঘবদ্ধ ক্ষাত্রশক্তি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধর্ম্মযুদ্ধে নামিয়া পড়িল।

তৃতীয় ধর্ম্মযুদ্ধের নায়ক ছিলেন ইংলণ্ডেশ্বর **সিংহহৃদয় রিচার্ড**, জার্ম্মান সম্রাট্ **ফ্রেডারিক বারবারোসা** এবং ফরাসীরাজ দ্বিতীয় **ফিলিপ**। রিচার্ড ছিলেন অসীম বলশালী দীর্ঘকায় পুরুষ; অশ্ব
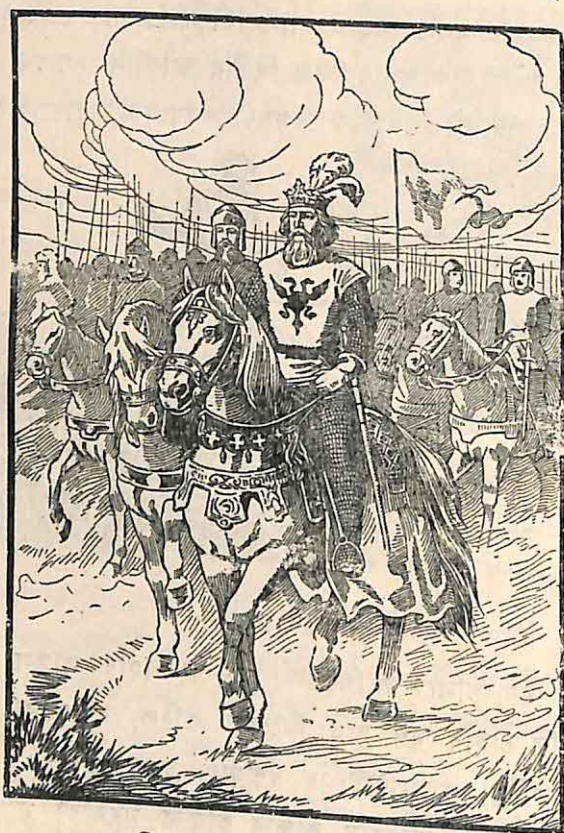
ফ্রেডারিক বারবারোসা ক্রুসেডে যাইতেছেন

এবং অস্ত্র পরিচালনায় কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। রিচার্ডের একজক তুর্কী শত্রু বলিয়াছেন, "রিচার্ডের তরবারির আঘাতে কেহ বাঁচিতে পারে না; তাঁহার কাজকর্ম্ম অমানুষিক।" যুদ্ধ

ও সঙ্গীতপ্রিয়, হাস্যরসিক, মুক্তহৃদয় এবং খোশমেজাজী এই রাজাকে অনেক রোমান্টিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। রক্তশ্মশ্রু ফ্রেডারিক বারবারোসা ছিলেন সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ। তিনি প্যালেষ্টাইন হইতে ফিরিবার সময় জলে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। ফিলিপও রিচার্ডের সহিত ক্রমাগত বিবাদ করিয়া অবশেষে ফ্রান্সে ফিরিয়া যান।

এই ধর্ম্মযুদ্ধের সময় তুর্কীদের সম্রাট ছিলেন **সালাহুদ্দীন** বা সালাদীন। সালাহুদ্দীন ছিলেন নিপুণ সেনাপতি, নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ক্ষমাশীল ও ধর্ম্মপ্রাণ সম্রাট্। সালাহুদ্দীন তৃতীয় ধর্ম্মযুদ্ধকে এক অপরূপ মর্য্যাদা দিয়াছেন। শত্রুর প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা তাঁহার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। রিচার্ড যখন যুদ্ধের সময় অসুস্থ হইয়া পড়েন, তখন সালাহুদ্দীন তাঁহাকে ফলমূল এবং বরফ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত ধর্ম্মযুদ্ধের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুপ্রশস্ত হয়। প্রাচ্য জগতের উন্নততর সভ্যতা এবং বিলাসসম্ভার ইউরোপীয়দের দৈনন্দিন জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। একটা নূতন জগৎ যেন তাহাদের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই যুদ্ধের ফলে খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের মধ্যেও একটা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়িয়া উঠে।

অষ্টম অধ্যায়

তুর্কীদের অভ্যুদয় ও ভারতে সুলতানী আমল

তুর্কীদের অভ্যুদয়—আব্বাস বংশীয় খলিফারা যে বিপুলায়তন আরব সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য করিতেন, অবশেষে তাহাও কালস্রোতে ভাসিয়া গেল। একজন খলিফা আরব সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদ হইতে নামে মাত্র শাসন করিতেন। সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে বহু স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশগুলি ছিল আরব, কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলের রাজবংশগুলি ছিল তুর্কী ও পারসিক। তুর্কীরা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল অনেক পরে। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর এইবার তাহারা মুস্লিম ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রধান নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাজ্যগুলির ভিতর প্রধান ছিল **গজনী** ও **খারিজম্**-এর তুর্কীগণ।

দশম শতাব্দীতে **আলপ্তগীন** নামে একজন তুর্কী ক্রীতদাস আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনীতে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আলপ্তগীনের জামাতা ও ক্রীতদাস **সবুক্তগীন** গজনীর অধিপতি হইলে বাগদাদের খলিফা তাঁহাকে খেলাত প্রদান করেন ও গজনীর স্বাধীনতা স্বীকার করেন। এই সবুক্তগীনের পুত্রই ছিলেন বিখ্যাত **সুলতান মামুদ**। সুলতান মামুদ সপ্তদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন গজনী রাজবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলতান।

একদল তুর্কী মধ্য-এশিয়ায় স্তেপ অঞ্চল ছাড়িয়া খোরাসানে বসবাস আরম্ভ করে। খোরাসানী তুর্কীদের নায়ক ছিলেন **সেলজুক**। তাঁহার নামানুসারেই এই শাখার তুর্কীগণকে সেলজুক-তুর্কী বলা হয়। পূর্ব্বে আব্বাস বংশীয় খলিফারা যে বিস্তৃত সাম্রাজ্যে রাজত্ব করিতেন, কাল-ক্রমে তাহার অধিকাংশ স্থানই এই সেলজুক তুর্কীদের হাতে চলিয়া গেল। আরব সভ্যতার আলোকে সেলজুক তুর্কীগণের আচার-ব্যবহারও উন্নত হইল। পরবর্ত্তী কালে যে সালাহুদ্দীন খৃষ্টান ধর্ম্মযোদ্ধাদের বিপক্ষে অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন সেলজুক তুর্কী। পূর্ব্বের অধ্যায়েই তাঁহার বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

সুলতান মামুদ

তুর্কীদের আর একটি শাখা ছিল **খারিজম্** বা খীবা নামক অঞ্চলে। খারিজমের শাহ্ সেলজুক সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে হানা দিয়া উহার একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু এই খারিজম্ রাজ্য একদিন মঙ্গোল আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। রণদুর্দ্ধর্ষ ও হিংস্র মঙ্গোল বাহিনীর নেতা চেঙ্গিস খাঁনের আক্রমণে মধ্য-এশিয়া ও পারস্য-ভূমি শ্মশানে পরিণত হইলে খারিজমের শাহের রাজ্য এবং রাজমুকুটও ভাসিয়া গেল। আফগানিস্থানের যে ঘুর রাজবংশ একদা উত্তর ভারতে মুসলমান

শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, উহারা এক সময়ে এই খারিজমের শাহের অধীনস্থ ছিলেন।

মুসলমানদের ভারত বিজয়—ভারতে প্রথম মুসলমান অভিযান আরম্ভ হয় হিজরীর প্রায় একশত বৎসর পরে। আরব সেনাবাহিনী তখন সিন্ধুপ্রদেশে ইসলামের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে, কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চল এই আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। ইহার প্রায় ৩০০ বৎসর পর গজনীর সুলতান মামুদ ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্যে প্রলুব্ধ হইয়া সপ্তদশবার উত্তর ভারত লুণ্ঠন করেন। ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্কল্প তাঁহার ছিল না। সুতরাং ভারতের অতি সামান্য অংশই তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রকৃত ভারত বিজয় আরম্ভ করেন ঘোরের **মইজুদ্দিন মহম্মদ**। ইতিহাসে তিনি সাধারণতঃ **মুহম্মদ ঘোরী** নামে পরিচিত। এই মুহম্মদ ঘোরীই উত্তর-ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর ঘোর প্রদেশের রাজা ও গজনীর সুলতানদের মধ্যে ভীষণ গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। মুহম্মদ ঘোরী যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন কাবুল অবধি সমস্ত গজনী সাম্রাজ্যই তাঁহার অধীনে ছিল। প্রথমে তিনি ভারতের অন্তর্গত **মুলতান** রাজ্য জয় করেন। তাহার তিন বৎসর পরে তিনি **গুজরাট** আক্রমণ করেন। কিন্তু সে-যুদ্ধে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। তাহার পর তিনি **পাঞ্জাব** দখল করিয়া উত্তর-ভারত আক্রমণের উদ্যোগ করেন।

উত্তর-ভারতের হিন্দুনরপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন দিল্লী ও আজমীরের চৌহান বংশীয় **পৃথ্বীরাজ** এবং কনৌজের গাহড়বাল বংশের **জয়চন্দ্র**। মুহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের সংবাদে উত্তর

ভারতের সমস্ত রাজা সম্মিলিতভাবে তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রায় পিথৌরা বা পৃথ্বীরাজ হইলেন এ সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। মহাভারতের বিখ্যাত কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের অদূরে থানেশ্বরের নিকটে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিল। সে যুদ্ধে মুহম্মদ ঘোরী পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। কিন্তু হিন্দু সৈন্যরা পরাজিত শত্রুর অনুসরণ করে নাই।

পৃথ্বীরাজ

এই যুদ্ধে সম্ভবতঃ জয়চন্দ্র যোগদান করেন নাই। কথিত আছে, তাঁহার সহিত পৃথ্বীরাজের মনোমালিন্য ছিল। তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্যবতী দুহিতা সংযুক্তাকে পৃথ্বীরাজ স্বয়ম্বর-সভা হইতে হরণ করিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য উভয়ের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। সুতরাং জাতীয় সঙ্কটকালে জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে সাহায্য করিলেন না। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ জয়ী হন, কিন্তু পর বৎসর মুহম্মদ ঘোরী পুনরায় তরাইনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। অনেকের ধারণা, জয়চন্দ্র এইবার মুহম্মদ ঘোরীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ নিহত হন; তাঁহার রাজ্যও মুসলমান আক্রমণকারীদের অধিকারভুক্ত হয়। পরবৎসর জয়চন্দ্রও রক্ষা পান নাই। এইরূপে একে একে উত্তর ভারতের সকল রাজাকে পরাজিত করিয়া মুহম্মদ ঘোরী আর্য্যাবর্ত্ত বিজয় সম্পূর্ণ করেন।

মুহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি ছিলেন **কুতুবউদ্দীন আইবেক**। তিনি মুহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার ভারতীয় সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরী আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হইলে কুতুবউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিল্লীতে প্রথম মুসলমান রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

কুতুবউদ্দীন ও তাঁহার পরবর্ত্তী কয়েকজন স্থলতান পূর্ব্ব জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। **মধ্য এশিয়া** ও আরব সাম্রাজ্যে তখন ক্রীতদাসদের লইয়া বর্দ্ধিষ্ণু ব্যবসা চলিত। সেযুগে যুদ্ধবন্দী ব্যতীতও ছলে বলে কৌশলে পশু শিকারের ন্যায় সুন্দর সুঠাম দেহধারী মানুষকে বন্দী করিয়া উচ্চমূল্যে বিক্রয় করা খুব লাভজনক বাণিজ্য বলিয়া গণ্য হইত। ক্রীতদাসরূপে পণ্যের ন্যায় বিক্রীত হইলেও বহু ক্রীতদাসই ছিল সুসভ্য ও অভিজাত বংশের সন্তান। অদৃষ্টের পরিহাসে তাহারা হয়ত ক্রীতদাসের জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

কুতুবউদ্দীন আইবেক

মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের উদারতার জন্য ক্রীতদাসের ভিতর কেহ রূপে-গুণে শৌর্য্যে-বীর্য্যে স্থলতানদের খুসী করিতে পারিলে রাজকন্যাকে বিবাহ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। রাজ্যের বড় বড় পদে নিযুক্ত হইয়া তাঁহারা কালক্রমে সুলতানের সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকার করিতে পারিতেন। এ বিষয়ে মুসলমান শাসকদের উদারতা ছিল সারা পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয়।

ভারতের সুলতানী সাম্রাজ্য—আগেই শুনিয়াছ কুতুবউদ্দীন প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী স্থলতানদের

মধ্যেও কেহ কেহ ক্রীতদাস থাকায় এই রাজবংশকে অনেক সময় দাসবংশ বলা হয়। দাসবংশের সুলতানদের মধ্যে **ইলতুৎমিশ, রাজিয়া, নাসিরুদ্দীন** ও **বলবন** সমধিক বিখ্যাত।

প্রথম জীবনে ইলতুৎমিশ কুতুবউদ্দীনের ক্রীতদাস ছিলেন, পরে তিনি তাঁহার জামাতারূপে বদায়ুনের শাসনকর্ত্তা হন। বিধাতা তাঁহাকে দিয়াছিলেন অপরূপ সৌন্দর্য্য ; ইহার সহিত বীরত্ব, শাসন-দক্ষতা, শিল্পানুরাগ ও বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের যোগ হইয়াছিল। ইলতুৎমিশ-ই দিল্লীতে সুলতানের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। মধ্য-এশিয়ার বর্ব্বর মঙ্গোল আক্রমণকারীদের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার্থে তিনি দৃঢ় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন।

তাঁহার রাজত্বের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল **চেঙ্গিজ খাঁর** ভারত আক্রমণ। একদা খারিজমের শাহের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে তিনি পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন। খারিজমের শাহ্ ভারতের সুলতানের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া **চেঙ্গিজ** খানের শত্রুতা বরণ করিতে ইলতুৎমিশ রাজী হন নাই। তিনি খারিজমের শাহের আবেদন মঞ্জুর করেন নাই। কথিত আছে, অতঃপর চেঙ্গিজ খাঁ ভারতবর্ষ ও তিব্বত হইয়া তাঁহার স্বীয় জন্মভূমি মঙ্গোলিয়ায় প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন এবং সেজন্য ভারতের সুলতানের নিকট সৈন্য চলাচলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি মত পরিবর্ত্তন করিয়া পেশোয়ার হইতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

মুসলিম অধিকারের যুগে রূপগুণসমন্বিতা রমণীগণও সিংহাসনে অধিবেশন করিতে পারিতেন। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইল ইলতুৎমিশের কন্যা সুলতানা **রাজিয়া**। তিনি সিংহাসনে আরোহণ

করিয়া অসামান্য কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ বলিয়াছেন, "রাজিয়া ছিলেন মহীয়সী সুলতানা, বুদ্ধিমতী, ন্যায়পরায়ণা, প্রজাহিতৈষিণী, রণপ্রতিভাসম্পন্না এবং বিদ্যোৎসাহিনী। এই মহিলার মধ্যে যাবতীয় রাজকীয় গুণের সমাবেশ হইয়াছিল।"

সুলতানা রাজিয়া

কিন্তু তিনি নারী ছিলেন বলিয়া ওমরাহ্‌গণ পদে পদে চক্রান্তের জাল বিস্তার করিয়া অবশেষে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করেন। তাহার ছয় বৎসর পর ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র **নাসিরুদ্দীন** দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন দুর্ব্বলচরিত্র, ধর্ম্মভীরু ও শান্তিপ্রিয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রথম ইস্‌লামের খলিফাদের ন্যায় সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। ঈশ্বরের আরাধনা ও ধর্ম্ম-চর্চ্চাতেই তাঁহার সময় কাটিয়া যাইত। কথিত আছে, তাঁহার মহিষীকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে হইত এবং সুলতান কোরাণ নকল করিয়া সেই অর্থে উভয়ের ব্যয় সঙ্কুলান করিতেন। একদা রন্ধন করিতে করিতে মহিষীর হাত পুড়িয়া গিয়াছিল। নাসিরুদ্দীন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া ঐ কথাই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ব্যক্তিগত যে আয় হয়, তাহাতে পাচক রাখিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই।

নাসিরুদ্দীনের রাজ-সিংহাসনের পিছনে অদৃশ্য শক্তি ছিলেন মহিষীর পিতা **গিয়াসুদ্দীন বলবন**। প্রকৃত পক্ষে তিনিই সমস্ত

রাজকার্য্য চালাইতেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল **উলুগ খাঁ**। চিঙ্গিজ খাঁর সহিত যে দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী ভারতে আসিয়াছিল, তাহার অবশিষ্টাংশ প্রায়ই ভারতের পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করিত। উলুগ খাঁর অপূর্ব্ব রণকুশলতায় তাহারা একবারও ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। নিঃসন্তান অবস্থায় নাসিরুদ্দীনের মৃত্যু হইলে গিয়াসুদ্দীন বলবন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইতিপূর্ব্বে দিল্লীর দরবারে ইলতুৎমিশের চল্লিশজন দাস ওমরাহের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। সম্রাটের ভ্রূকুটিকে তাহারা উপেক্ষা করিবার সাহস রাখিত। পূর্ব্বে বলবনও ছিলেন ইহাদের মধ্যে একজন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি এই দুরন্ত আমীরগণের দমনে আত্মনিয়োগ করেন। বলবনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ফলে আমীরগণের ক্ষমতা ক্রমেই কমিয়া আসিল। তিনি সৈন্য ও রাজস্ব বিভাগেরও সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি যে প্রবল সেনাদল গঠন করিয়াছিলেন, তাহাদের বাধা অতিক্রম করিয়া বাগদাদ বিজয়ী হুলাগু খানের মত দুর্দ্ধর্ষ মঙ্গোলদেরও ভারতে প্রবেশ করিবার সাধ্য হয় নাই।

গিয়াসুদ্দীন বলবন

তাঁহার রাজসভার জাঁকজমক দেখিয়া লোকে অবাক্ হইয়া যাইত। দেশ-দেশান্তর হইতে লোকে তাঁহার রাজসভার জাঁকজমক দেখিতে আসিত। তিনি নিজে কখনও কাহারও সহিত লঘু হাস্য-পরিহাস করিয়া রাজসভার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতেন না।

গিয়াসুদ্দীন বলবন আমীরদের অত্যাচারও কঠোর হস্তে দমন করিয়াছিলেন। জনৈক আমীর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় একজন

চাকরকে হত্যা করিয়াছিলেন। চাকরটির বিধবা স্ত্রী গিয়াসুদ্দীনের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিলে তিনি নিজেই ইহার বিচার করেন। বিচারে ঘটনা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় তিনি বেত্রাঘাতে আমীরকে হত্যার আদেশ দেন এবং গুপ্তচরগণ তাঁহাকে যথাসময়ে এ সংবাদ দেয় নাই বলিয়াই তাহাদেরও তিনি ফাঁসি দেন।

আমীর খুসরু প্রভৃতি বহু বিখ্যাত কবি ও লেখক বলবনের সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। মঙ্গোল আক্রমণের মুখে পলায়নপর মধ্য-এশিয়ার মুসলমান রাজ্যের পনেরো জন রাজপুত্র তাঁহার দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে-যুগে মঙ্গোল আক্রমণে মুসলমান জগতে খলিফার সাম্রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, সে-যুগে নিজের সদাজাগ্রত দৃষ্টি ও অধ্যবসায়ের বলে বলবন সেই বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া স্বীয় রাজধানীকে মুসলমান সভ্যতার শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন বলবনের মৃত্যুর পরেই দাসবংশের প্রাধান্য লোপ পায়। দিল্লীর রাজসিংহাসন তখন চলিয়া যায় **খল্‌জী** বংশের হস্তে। এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত রাজা ছিলেন **আলাউদ্দীন খল্‌জী**। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে তিনিই সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে দিল্লীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য এবং ইহাতে তিনি অনেকাংশে সফলও হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিকল্পনানুযায়ী **গুজরাট, রণথম্ভোর, চিতোর, মালব, উজ্জয়িনী** প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার করতলগত হইল। ইহার পর **দেবগিরি,**

আলাউদ্দীন খল্‌জী

কাশ্মীর
আফগান
সাম্রাজ্য
মুলতান
সিন্ধু ও
রাজপুতনা
জৌনপুর
বিহার
বুন্দেলখণ্ড
বঙ্গদেশ
গুজরাট
মালব
খান্দেশ
গণ্ডোয়ানা
আহম্মদ নগর
বেরার
বিদর
বিজাপুর
গোলকুণ্ডা
বিজয়নগর
আফগান সাম্রাজ্য
সুলতানী যুগের চরম বিকাশের সময় স্বাধীনদেশ
১৫২৫ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনদেশ
সুলতানী সাম্রাজ্যের চরমবিকাশ

বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র এবং **মাতুরায়ও** সুলতানী বিজয় কেতন উড়িল। আলাউদ্দীনের এই দিগ্বিজয়ের ফলে আসাম এবং কাশ্মীর ব্যতীত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ দিল্লীর শাসনাধীনে চলিয়া গেল।

এই বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য আলাউদ্দীনের বিরাট্ সৈন্যবাহিনী ছিল। তাঁহার রাজত্বে সৈন্যরা যে বেতন পাইত, সাধারণ সময়ে তাহাতে তাহাদের বেশ চলিয়া যাইত। কিন্তু দুর্ভিক্ষ কিংবা মঙ্গোল আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলেই ব্যবসায়িগণ জিনিষপত্রের দর চড়াইয়া দিত। তখন সৈন্যদের বড় কষ্ট হইত। সেই কষ্ট লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দীন সমস্ত পণ্যদ্রব্যের এক ন্যায়সঙ্গত নির্দিষ্ট বাজার-দর বাঁধিয়া দেন। কেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইত। মধ্যযুগে পৃথিবীর অন্য কোথাও এ জাতীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রণের কথা শোনা যায় নাই। সেযুগের ইতিহাসের ইহা এক অভাবনীয় ব্যাপার।

রাজ্যে গুপ্ত চক্রান্ত ও বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তিনি মদ্যপান নিষিদ্ধ করিয়া দেন। তাছাড়া হিন্দু প্রজার হাতে প্রয়োজনের অধিক ধনরত্ন থাকাকে তিনি নিরাপদ মনে করিতেন না। তাই সর্ব্বদা তিনি হিন্দু ধনীর ধনসম্পদ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেন।

প্রথম জীবনে তিনি লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু রাজ্যের রাজা মূর্খ হইলে রাজ্য পরিচালনায় অসুবিধা হয় বলিয়া, তিনি গোপনে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। শিল্প এবং সাহিত্যেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি কুতুব মস্‌জিদ সংস্কার করিয়া **আলাঈ দরজা** নির্ম্মাণ করান। তিনি এমন কঠোর ন্যায় বিচারের

প্রবর্ত্তন করিরাছিলেন যে, পথিকগণ নির্ভয়ে পথে চলিতে পারিত এবং পথের উপরেই মালপত্র রাখিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারিত।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর দিল্লীতে **তুঘলক্** রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন **মুহম্মদ-বিন্-তুঘলক্** ও **ফিরুজশাহ্ তুঘলক্**। **মুহম্মদ্-বিন্-তুঘলক্** ছিলেন বিশ্বের বিস্ময়, ইতিহাসের এক অপূর্ব্ব চরিত্র। তাঁহার বিদ্যা ছিল অগাধ, কল্পনা শক্তি ছিল একান্ত উর্ব্বর, হৃদয়ের উদারতা ছিল অসীম। কোন সুলতানই ইতিপূর্ব্বে তাঁহার ন্যায় রাজকার্য্যে এত মস্তিষ্ক চালনা করেন নাই। রণনৈপুণ্যেও তাঁহার তুলনা ছিল না। তিনি চরিত্রবান, ধার্ম্মিক এবং দানশীল বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইনিই বিলাসী আরব ভ্রমণকারী ইবন্-বতুতাকে আশাতিরিক্ত পারিশ্রমিকে কাজীর পদে নিযুক্ত করেন। এইরূপ আরও বহু লোক তাঁহার অনুগ্রহে প্রচুর বিত্তশালী হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্যদিকে আবার প্রজাদের উপর নৃশংস অত্যাচার করিয়া তিনি তাঁহার রাজত্বকালকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। চঞ্চলচিত্ত ও কোপনস্বভাব এই সুলতানের বাস্তবজ্ঞান অত্যন্ত অল্প থাকায় তাঁহার সমস্ত গুণাবলী ও জীবনব্যাপী সাধনা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপনের পরিকল্পনা, ইরাক্ ও খোরাসান জয়ের সঙ্কল্প এবং তামার নোট প্রচলন তাঁহার এই অস্থির-মস্তিষ্ক লঘু প্রকৃতির পরিচায়ক। এই সমস্ত পরিকল্পনার ব্যর্থতায় দেশের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বিদ্রোহে রূপান্তরিত হইল—দিকে দিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং অনেক প্রদেশ স্বাধীন হইল। অবশেষে সুলতান সিন্ধুদেশে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ঐতিহাসিক বদায়ুনী বলিয়াছেন, "এইরূপে সুলতান

প্রজাদের হাত হইতে বাঁচিলেন, প্রজারাও সুলতানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল।”

এই অন্তঃসারশূন্য শীর্ণকায় রাজ্যের পরবর্ত্তী সুলতান হইলেন ধর্ম্মভীরু, দুর্ব্বলচরিত্র **ফিরুজশাহ্ তুঘলক্**। তিনি সেনাপতি হিসাবে অপদার্থ ছিলেন, কিন্তু শাসনকার্য্যে যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজস্ব এবং বিচার বিভাগে তিনি অনেক সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন। কৃষিকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করা, পান্থশালা, চিকিৎসালয় ও মস্‌জিদ স্থাপন তাঁহার শাসনকালের স্মরণীয় ঘটনা। এই সমস্ত সুব্যবস্থার ফলে দেশে কিছুদিনের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে শের শাহ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সম্রাট্ আকবর অবধি সকলেই শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সুলতানী যুগের শেষ অধ্যায়—ফিরুজশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য যেন দুঃস্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল। সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্রপৌত্রাদির মধ্যে কলহ, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের বিদ্রোহ এবং সর্ব্বোপরি **তৈমুরলঙ্গের আক্রমণ** শেষ যুগের সুলতানী শাসনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। তৈমুরের আক্রমণে দিল্লী একেবারে শ্মশান হইয়া গেল। অরাজকতার এই সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণও স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্ব্বলতায় বঙ্গদেশ, বিহার, জৌনপুর, মালব, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশ স্বাধীন হইয়া গেল। দক্ষিণ ভারতেও বাহ্‌মনী ও বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল।

এই ক্ষীণায়মান তুঘলক্ রাজ্যের শেষ সুলতান ছিলেন মামুদশাহ্ তুঘলক্। তাঁহার মৃত্যুর পর **সৈয়দবংশ ও লোদীবংশ**

ক্রমান্বয়ে ১১২ বৎসর কাল দিল্লী ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে রাজত্ব করেন। সৈয়দগণ আরব বংশসম্ভূত বলিয়া প্রবাদ আছে। লোদীগণ ছিলেন আফগান বা পাঠান জাতীয়। অবশেষে দিল্লী ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে সীমাবদ্ধ দিল্লীর রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব করিয়া সৈয়দ ও লোদীবংশ ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বিদায় লইল।

এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে সুলতানী আমলের শেষ যুগে দিল্লীর রাজমুকুট যেন পথের ধূলায় লুটাইতেছিল। অবশেষে শেষ লোদীরাজ **ইব্রাহিম লোদীকে** পরাজিত করিয়া বাবর তরবারির মুখে দিল্লীর সেই রাজমুকুটটি তুলিয়া লইলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল।

সুলতানী যুগের সভ্যতা—সুলতানী আমলে হিন্দু ও মুসলমানদের সভ্যতা ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর মত কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। ইহার ফলে দুইটি সভ্যতাই পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করিল। ইস্‌লাম ও হিন্দু ধর্ম্মের সার সংগ্রহ করিয়া অনেক ধর্ম্ম-প্রচারক নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। **রামানন্দ, কবীর, নানক** প্রভৃতি মহাপুরুষগণ হিন্দু ধর্ম্ম ও ইস্‌লামের সমন্বয় সাধনায় অনেকখানি কৃতকার্য্য হইলেন। তাঁহারা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন।

সে যুগের হিন্দু-মুসলমানের মিলনধর্ম্মী আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন কবীর। মুসলমান বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার মুসলমান ভক্ত যত ছিল, হিন্দু ভক্তও উহার কম ছিল না। তিনি সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া প্রাদেশিক হিন্দী ভাষাতেই নিজের বাণী প্রচার করিলেন।
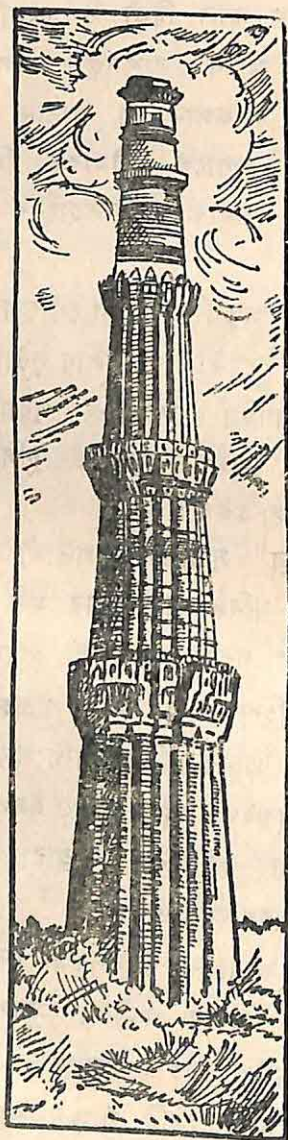
কুতুব মিনার

কবীরের ভাবধারার প্রধান উত্তরাধিকারী হইলেন **নানক**। পাঞ্জাবী মেশানো হিন্দী বুলিতে তাঁহার বাণী রচিত। তিনিই শিখ ধর্ম্মের আদি গুরু; তাঁহার হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই শিষ্য ছিল। তিনি ছিলেন উদারহৃদয়।

নানক

কাশ্মীররাজ **জয়নাল আবেদীনের** দরবারে সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ পঠিত ও অনূদিত হইত। সংস্কৃত ছাড়া প্রাদেশিক ভাষা এবং সাহিত্যেও যেন এই সময়ে নূতন প্রাণ সঞ্চার হইল। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ও মারাঠী ভাষা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

বাক্য এবং ঐতিহাসিক রচনাতেও এই যুগ স্মরণীয়। ফারসী লেখক মীনহাজ, খুসরু, আল্-বিরুণী এই যুগের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। হিন্দু ও মুস্লিম এই দুই সভ্যতার সংঘাতে একটি নূতন ভাষারও সৃষ্টি হইল; ইহাই উর্দ্দু ভাষা। শুধু ধর্ম্মে এবং সাহিত্যে নহে, স্থাপত্য-শিল্পেও যেন এক নূতন যুগের প্রভাত হইল। **কুতুব মিনারের** বিশাল পরিকল্পনা, **আলাঈ দরজার** সূক্ষ্ম কারুকার্য, **ফিরুজশাহ কোত্লার** শান্ত গাম্ভীর্য্য এবং **তুঘ্লকাবাদের** স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন সুলতানী আমলকে একটি স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে, ভারতীয় হিন্দুদের স্থাপত্যশিল্পের একটা নিজস্ব রূপ ছিল। বিদেশী মুসলমানদেরও তেমনি একটা
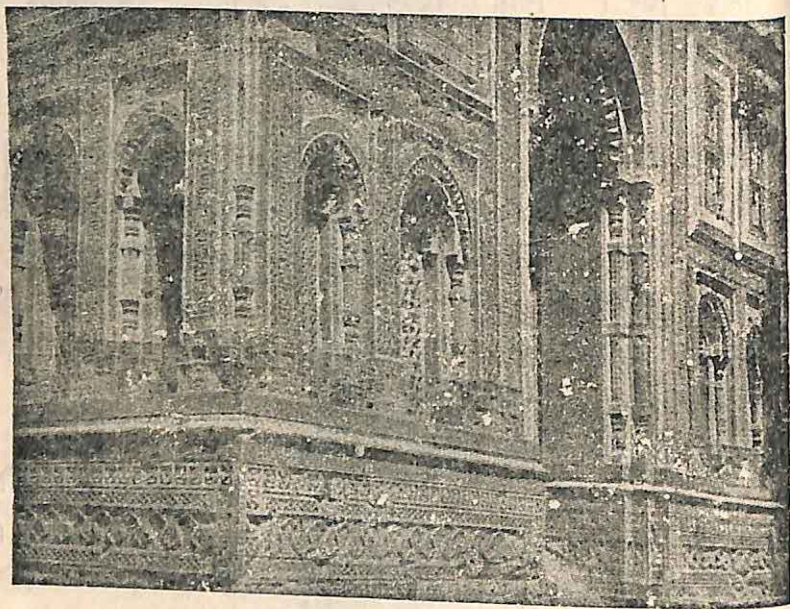
আলাঈ দরজা

স্বকীয় স্থাপত্য পদ্ধতি ছিল ; কোন কোন স্থলে এই তুই শিল্প-ধারার সংমিশ্রণে একটা নূতন স্থাপত্য পদ্ধতির উদ্ভব হয়। **গৌড়, জৌনপুর,** এবং **গুজরাটের** মস্‌জিদ, সমাধি-সৌধ প্রভৃতি এই মিশ্র স্থাপত্য পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
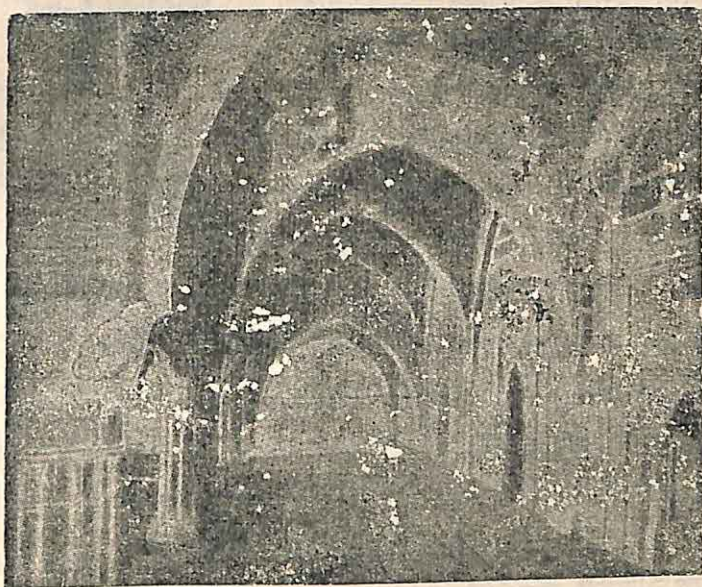
আদিনা মস্‌জিদ (পাণ্ডুয়া)

সুলতানী যুগের সমাজ-জীবন—বৈদেশিক পর্য্যটনকারী এবং এদেশের কবি ও ঐতিহাসিকগণের রচনা হইতে সমসাময়িক সুলতানী আমলের সমাজ-জীবন সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য অবগত হওয়া যায়। এই তথ্য পূর্ণাঙ্গ না হইলেও উহা হইতে সমাজ-জীবনের যে-চিত্র পাওয়া যায়, তাহা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। তখন দেশের ঐশ্বর্য্য ছিল বিপুল। সুলতান মামুদ ও তৈমুরের লুণ্ঠিত

ধনরত্নাদির বিবরণ হইতে সেই সময়ের ঐশ্বর্য্যের কিছুটা পরিমাপ করা যায়। কিন্তু এই ঐশ্বর্য্য রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশের ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে তখন বিশাল ব্যবধান ছিল।

তৈমুরলঙ

কবি আমীর খুস্‌রু বলিয়াছেন, "রাজমুকুটের প্রত্যেকটি মুক্তা হইল কৃষকদের জমাট রক্তবিন্দু"। বস্তুতঃ মধ্যযুগের কৃষকদিগকে নানারূপ দারিদ্র্য ও দুরবস্থার মধ্যে জীবন কাটাইতে হইত। তবুও রাজ্যের উত্থান-পতনের মধ্যে তাহারা নির্ব্বিকার ভাবে তাদের সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিত। দ্রব্যাদির মূল্যও ছিল খুব কম। বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্যের ব্যাপকতা ছিল বিশাল।

রুশ দেশীয় পর্য্যটক **নিকিটিন** ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাহমনী রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে সেখানকার অভিজাত সম্প্রদায় ও সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। নিকিটিন লিখিয়াছেন, "দেশ জনবলে সমৃদ্ধ। পল্লী অঞ্চলের লোকের দুরবস্থার সীমা নাই, কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা অত্যন্ত ধনবান এবং বিলাসপ্রিয়। তাঁহারা রূপার পালঙ্কে যাতায়াত করে। তাঁহাদের পুরোভাগে থাকে কুড়িটি স্বর্ণ সজ্জিত অশ্ব, পশ্চাতে ৩০০ জন অশ্বারোহী ও ৫০০ জন পদাতিক ও ভেরী বাদক, ১০ জন মশালচী ও ১০ জন গায়ক।"

সুলতান শিকারে বাহির হইবার সময় তাঁহার সঙ্গিনী হন রাজমাতা ও রাজমহিষী। সঙ্গে থাকে ১০ হাজার অশ্বারোহী, ৫০ হাজার পদাতিক, ১০০ জন নর্ত্তকী, ১০০টি বানর এবং ১০০ জন বিদেশী নারী। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, সাধারণ লোকেদের জীবন অভিজাত সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক নিরানন্দময় ও কঠোর ছিল।

বিজয়নগরের বিপুল ঐশ্বর্য্যের সম্বন্ধেও অনেক বৈদেশিক ভ্রমণকারী মনোজ্ঞ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে পারস্য হইতে আগত **আব্দুর রজ্জাকের** নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রায় দুই বৎসরকাল বিজয়নগরে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "দেশ জনবহুল। রাজকোষের অনেক কক্ষ গলিত স্বর্ণের স্তূপে পরিপূর্ণ। দেশের সমস্ত লোক ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে মণিমুক্তা এবং গিল্টিকরা অলঙ্কার কর্ণে, কণ্ঠে, মণিবন্ধে এবং অঙ্গুলীতে পরিধান করে।" বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া মনে হয় যে, এখানে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য নিতান্ত কম ছিল না। তবে, শুধু ভারতেই নয়, সমসাময়িক জগতের সমাজ-জীবনের ইহাই সাধারণ চিত্র বলিলেও বোধ হয় ভুল হইবে না।

মধ্যযুগের ভারতীয় রাজা এবং অভিজাত সম্প্রদায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে ক্রীতদাস সংগ্রহ করিতেন। কথিত আছে, ফিরুজশাহ্ তুঘলকের একলক্ষ আশী হাজার ক্রীতদাস ছিল এবং তাহাদের প্রতিপালনের জন্য রাজকোষ হইতে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইত। সময় সময় সুলতানেরা কর্ম্মদক্ষ প্রতিভাবান ক্রীতদাসগণকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। ক্রীতদাসেরা প্রভুর সেবাকার্য্য করিত ; প্রভুগণ অনেক সময় তাহাদিগকে দিয়া নানা দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া আর্থিক লাভবানও হইতেন।

সমাজে নারীর স্থান ছিল অনেক উচ্চে। সাধারণতঃ তাঁহারা স্বামী বা পুরুষ অভিভাবকের উপর নির্ভরশীলা ছিলেন। গুজরাটের কোন কোন অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র ভারতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে পর্দ্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল। পল্লী অঞ্চলের মহিলারা সাধারণতঃ গৃহকার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিতেন; কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে অনেকে সুকুমার শিল্পের চর্চ্চা করিতেন। কেহ কেহ উচ্চ শিক্ষিতাও ছিলেন। এই প্রসঙ্গে **রূপমতী** ও **পদ্মাবতীর** নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন বৈদেশিক ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন যে, বিজয়নগর রাজ্যে মহিলা হিসাব-রক্ষক, গায়িকা এবং কুস্তীগীরও ছিলেন। অনেক মহিলা অস্ত্র পরিচালনাতেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বিজয়নগরের রাজমহিষী স্বয়ং ছিলেন সঙ্গীত-শাস্ত্রে পারদর্শিনী। তখন ভারতে হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

নবম অধ্যায়

বঙ্গদেশের ইতিকথা

বঙ্গদেশ অতি প্রাচীন। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশের নাম পাওয়া যায়। সে কালের বঙ্গদেশে বৈদিক সভ্যতার প্রচার হয় নাই। মহাভারতেও বঙ্গদেশের বহু উল্লেখ আছে। বঙ্গদেশ গৌড়, বঙ্গ, সমতট প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া বঙ্গদেশ আংশিকভাবে আপন শাসনাধীনে আনয়ন করেন। এই সময় হইতে গুপ্তযুগ পর্য্যন্ত কয়েক শত বৎসরের বঙ্গদেশের ইতিহাস অস্পষ্ট। গুপ্তযুগের বঙ্গদেশ গুপ্তরাজদিগের অধীন ছিল।

গুপ্তযুগের অবসান ঘটিলে বঙ্গদেশ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছিল। তখন কয়েকজন সামন্ত দেশে প্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তিনজনের নাম উল্লেখযোগ্য—**গোপচন্দ্র, ধর্ম্মাদিত্য** ও **নরেন্দ্রাদিত্য সমাচারদেব**। ইঁহাদের মধ্যে প্রধানতম ছিলেন গোপচন্দ্র। বর্দ্ধমান হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে ত্রিপুরা জেলা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল বোধ হয় ফরিদপুর কিংবা ত্রিপুরা জেলায়।

রাজা গোপচন্দ্র বাংলার লোকসাহিত্যে অমর হইয়া আছেন। গোপচন্দ্রের পিতা ছিলেন মানিকচন্দ্র এবং মাতা ময়নামতী। পিতার মৃত্যুর সময় গোপচন্দ্র মাতৃগর্ভে ছিলেন। তাই জন্মমাত্রই তিনি সিংহাসন লাভ করেন। কিশোর বয়সেই হরিশ্চন্দ্রের

পরমাসুন্দরী কন্যা অতুনার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আঠারো বৎসর বয়স হইলে ময়নামতী গোপচন্দ্রকে ১২ বৎসরের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। ময়নামতীর গুরুদেব হাড়িসিদ্ধা তাঁহাকে দীক্ষা দেন। অতি দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া তাঁহার সন্ন্যাসের কয়েকটি বৎসর ব্যয়িত হয়। অবশেষে সন্ন্যাসকাল উত্তীর্ণ হইলে তিনি পুনরায় রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। গোপচন্দ্রের যৌবনের সন্ন্যাস অবলম্বনের কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়াই বাংলার বিখ্যাত গীতিকবিতা **ময়নামতীর গান** রচিত হইয়াছে।

গোপচন্দ্র ও অন্যান্য রাজা সম্বন্ধে অতি সামান্য সংবাদ জানা গিয়াছে। তাঁহাদের পরে গৌড়ের স্বাধীন রাজারূপে যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, পূর্ব্বে তিনি ছিলেন অন্য এক নরপতির মহাসামন্ত। পরে তিনি স্বাতন্ত্র্যলাভ করিয়া উত্তর ভারতের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় রচনা করেন। ইনিই হইলেন মহারাজ শ্রীহর্ষের সমসাময়িক **শশাঙ্কদেব**। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া কর্ণ-সুবর্ণে (বর্ত্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটির নিকট কানাসোনা) রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ও তাঁহার ভ্রাতার সহিত শশাঙ্কদেবের সংঘর্ষের কাহিনী পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

শশাঙ্কদেবকে অনেকে বৌদ্ধবিদ্বেষী বলেন। কথিত আছে, তিনি নাকি একবার কুশীনগরের বিহারের ভিক্ষুদের তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া পাটলীপুত্রে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন অঙ্কিত একটি প্রস্তরখণ্ড গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম কাটিয়া ফেলিয়া উহার মুল পর্য্যন্ত পোড়াইয়া দিয়াছিলেন

এবং একটি বৌদ্ধমূর্ত্তি সরাইয়া তাহার স্থানে শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙ্ মগধে গিয়া বুদ্ধগয়ায় ভ্রমণ করিতে আসিয়া শুনিয়াছিলেন যে, শশাঙ্কদেব বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম কাটিয়া ফেলিয়াছেন। এই পাপেই নাকি কুষ্ঠজাতীয় রোগে কিছুকাল মধ্যেই শশাঙ্কদেবের মৃত্যু হইয়াছিল। তবে গল্পটি কতদূর সত্য তাহা বলা কঠিন।

পাল রাজবংশ—মহারাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর প্রায় ১০০ বৎসর পরে বাংলাদেশে দেখা দিয়াছিল মাৎস্যন্যায় বা ব্যাপক অরাজকতা। এই দুর্দ্দিনে জনসাধারণ **গোপালদেবকে** রাজা নির্ব্বাচিত করিল। তিনি বিখ্যাত পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার সুশাসনে দেশ হইতে অরাজকতা দূর হইল; লোকে আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

তাঁহার পুত্র **ধর্ম্মপাল** (৭৭০ খৃঃ) উত্তর ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কিছুকালের জন্য উত্তর ভারতের বিলাসিতা ও সংস্কৃতির রাজধানী কনৌজ দখল করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই উত্তর ভারতে গুর্জ্জর-প্রতিহার এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণের সহিত গৌড়রাজ্যের দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের সূচনা হয়। তিনি পাটলিপুত্রের প্রাচীন মহিমা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করেন।

তাঁহার পুত্র ছিলেন **দেবপাল**। দেবপাল পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি গুর্জ্জর এবং দ্রাবিড়গণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। আসাম এবং উড়িষ্যা বিজয়ও তাঁহার রাজত্বকালের স্মরণীয় ঘটনা। হুণ এবং কম্বোজ জাতির সহিত সংঘর্ষে তিনি বিজয়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার সভাকবি তাঁহাকে

আসমুদ্র হিমাচলের অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, উত্তর ভারতে দেবপালের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সমসাময়িক নরপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার খ্যাতিও ছিল সুদূরপ্রসারী। সুবর্ণ দ্বীপ বা সুমাত্রার অধিপতি **বালপুত্রদেব** তাঁহার অনুমতি লইয়া নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি বাংলাদেশকে যে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সম্রাট্‌গণ তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনিই পালবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি।

দেবপালের মৃত্যুর পর পালবংশের গৌরবরবি অস্তগামী হইল। এই সময় কম্বোজ বংশীয় রাজগণ সহসা ধূমকেতুর মত বাংলাদেশের ইতিহাসে আবির্ভূত হইল। তাহারা কোথা হইতে আসিল কেহ বলিতে পারে না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, তিব্বত অথবা কাম্বোডিয়া তাহাদের বাসভূমি বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। প্রায় একই সময়ে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত রাজা রাজেন্দ্র চোলদেবের আক্রমণও পাল সাম্রাজ্যকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। **প্রথম মহীপালদেব** দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের পর পাল সাম্রাজ্যকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন বটে, কিন্তু ইহার অতীত গৌরবের যুগ আর ফিরিয়া আসিল না; এই পতনের মুখে উত্তর-বঙ্গের কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ পাল সাম্রাজ্যকে কঠিন আঘাত হানিল। কৈবর্ত্ত-নেতা **দিব্বোক** এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র **ভীম** ছিলেন এই বিদ্রোহের প্রধান পরিচালক। পরে পালবংশের **রামপালদেব** প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অক্ষম উত্তরাধিকারিগণ আর পাল সাম্রাজ্য

রক্ষা করিতে পারিলেন না। কর্ণাটের সেনবংশ দুর্ব্বল পালরাজার হাত হইতে বাংলার শাসনভার কাড়িয়া লইলেন।

সেন রাজবংশ—সেনগণ ছিলেন বাংলার শেষ হিন্দু রাজবংশ। এই বংশের রাজা বল্লালসেন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে। তাঁহার পুত্র **লক্ষ্মণসেন** ছিলেন সমগ্র বাংলাদেশের শেষ পরাক্রান্ত হিন্দু অধিপতি। লক্ষ্মণসেন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর। পিতামহ বিজয়সেনের আমলেই তিনি গৌড়, কলিঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি দেশে বহু যুদ্ধ করিয়া অশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পুরী, বারাণসী এবং প্রয়াগে তাঁহার বিজয়-স্তম্ভ প্রোথিত হইয়াছিল। যে সকল তুর্কী সেই সময় বাংলায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ভারতে লক্ষ্মণসেনের মর্য্যাদা ছিল বাগদাদের খলিফার সমতুল্য। বিহার জয় করিবার পর বখ্‌তিয়ার খিলজী বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। তিনি অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে দ্বিপ্রহরে রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিছনে ছিল সৈন্যদল। নগরে প্রবেশ করিবার পর অতর্কিত ভাবে তিনি লক্ষ্মণসেনের রাজধানী আক্রমণ করিলে, রাজা লক্ষ্মণসেনকে রাজধানী নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইয়াছিল। ইহার পরও বহু দিন পর্য্যন্ত সেনরাজগণ পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে বাংলার সভ্যতা—পাল এবং সেন রাজাদের রাজত্বকালে বাংলায় অনেক মনীষী এবং লেখকের আবির্ভাব হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন **চর্যাপদের** রচনাকালও সম্ভবতঃ এই সময়ই। এই গীতিগুলি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সাধকদের

জীবনাচরণের **সঙ্গীত**। পাল রাজত্বের প্রায় শেষ দিকে সন্ধ্যাকর নন্দী একখানি ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করেন। ইহার নাম **রামচরিত**। এই কাব্যটি এমন মুন্সীয়ানার সহিত রচিত হইয়াছে যে ইহা এক অর্থে রামায়ণের কাহিনী অপর অর্থে রামপাল ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের ইতিহাস।

সেনরাজগণ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। **বল্লালসেন** স্বয়ং **দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর** নামে দুইখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি **জয়দেব** 'গীতগোবিন্দের' অতুলনীয় ভাষায় ও ছন্দে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিয়াছেন। ঐ কাব্য রচনা সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। জয়দেবের বিবাহ লইয়াও একটি সুন্দর আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। কথিত আছে এক ব্রাহ্মণ স্বীয় কন্যাকে জগন্নাথদেবকে প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীক্ষেত্রপুরীতে গিয়াছিলেন। তথায় দৈববাণী হয়, "তুমি এই কন্যা জয়দেবকে সম্প্রদান কর।" ব্রাহ্মণ তখনই সেই মন্দিরে দর্শনার্থীদের মধ্য হইতে সন্ন্যাসীবেশী জয়দেবকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কন্যা সম্প্রদান করেন। জয়দেব বৃন্দাবনের কেশীঘাটে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রাধামাধবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রত্যহ পূজা করিতেন।

মুসলমান আমলের পূর্ব্বে রাজা লক্ষ্মণসেনের মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ **হলায়ুধ** ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য। প্রথম যৌবনে তিনি ছিলেন রাজপণ্ডিত। পরিণত যৌবনে তিনি হইয়াছিলেন মহামাত্য বা প্রধান মন্ত্রী এবং প্রৌঢ় বয়সে মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল অতুলনীয়। তিনি কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে অধিকাংশই এখন লুপ্ত।

বাংলায় বহু বৌদ্ধবিহার ছিল। ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ-কাহিনী হইতেই তাহা জানা যায়। সেকালের বৌদ্ধ বিহারের মধ্যে **ওদন্তপুরী, সোমপুরী** ও **বিক্রমশীলার** নামই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সোমপুরী মহাবিহার ছিল বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বিহার। এই বিহারেরই ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে রাজশাহী জেলার **পাহাড়পুরে**। বিহারটি ছিল ত্রিতল। ধাপে ধাপে সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় তলায় মন্দিরের ঘর। মন্দিরের চারিদিকে সুপ্রশস্ত আঙ্গিনা। এই মহাবিহার ধর্ম্মপালদেবের পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিক্রমপুরের বিক্রমশীলা মহাবিহার পালরাজগণের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সমস্ত মহাবিহারে বসিয়া অগণিত খ্যাত ও বিস্মৃতনামা আচার্য্যগণ যুগের পর যুগ ধরিয়া জ্ঞান সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

বিক্রমশীলার একজন আচার্য ছিলেন **অতীশ দীপঙ্কর**। তাঁহার জন্ম গৌড়রাজ-পরিবারে, জন্মভূমি বঙ্গালদেশের বিক্রমণিপুরে। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী, মাতা প্রভাবতী। তিনি ১৯ বৎসর বয়সে ওদন্তপুরী বিহারে মহাসঙ্ঘিক আচার্য্য শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার নাম হয় শ্রীজ্ঞান। তিনি দ্বাদশবর্ষ সুবর্ণদ্বীপে বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তির নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিলে বাংলাদেশের রাজা মহীপালদের তাঁহাকে বিক্রমশীলা মহাবিহারে মহাচার্য্য পদে নিযুক্ত করেন। দীপঙ্করের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহু দেশ জুড়িয়া ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে গুণমুগ্ধ তিব্বতরাজ দীপঙ্করকে তিব্বত যাইবার জন্য অন্তিম অনুরোধ জানান।
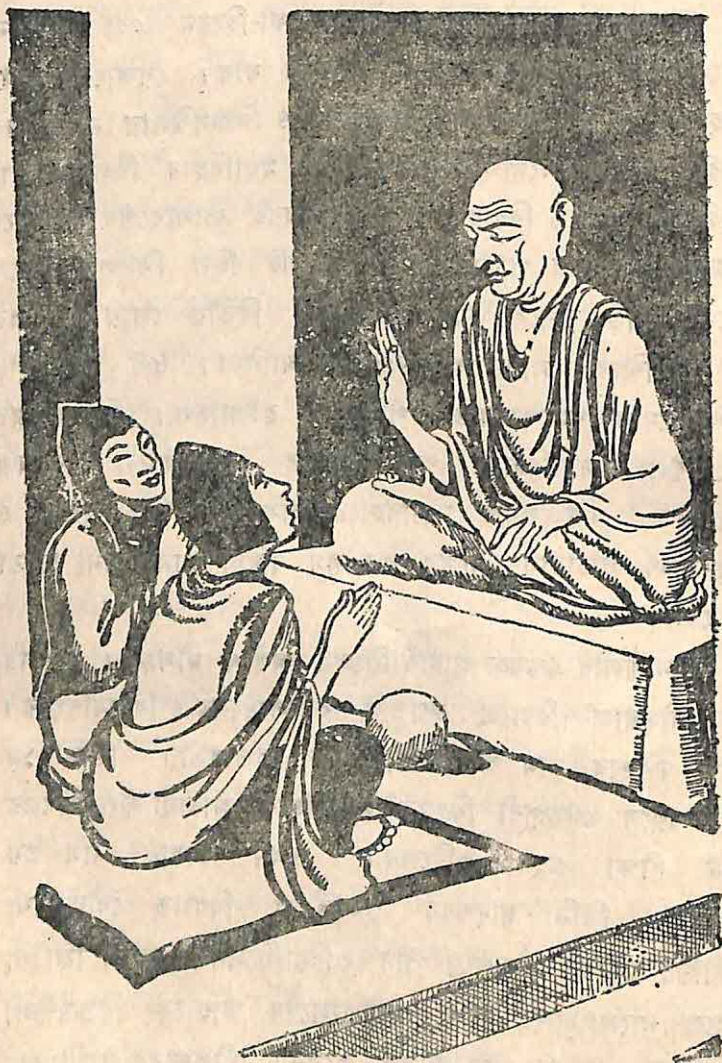
শিষ্যসহ আলোচনারত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

দীপঙ্কর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধিনায়ক তিব্বতী রাজদূতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অতীশ না থাকিলে ভারতবর্ষ অন্ধকার। অসংখ্য তুরস্ক সৈন্য ভারত আক্রমণ করিতেছে, আমি অত্যন্ত চিন্তিত বোধ করিতেছি। মনে হয়, ভারতবর্ষের দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। তবু আশীর্ব্বাদ করিতেছি সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য অতীশের সেবা ও কর্ম্ম নিয়োজিত হউক।"

যাত্রীদল নেপাল ও হিমালয়ের দুর্গম পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাত্রাপথে তাঁহারা একাধিকবার দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। অবশেষে দীপঙ্কর নেপালের রাজপুত্রকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তিব্বতে পৌঁছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনা হইল রাজসমারোহে। তিনি ১৩ বৎসর তিব্বতের সর্ব্বত্র মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া অবশেষে ৭৩ বৎসর বয়সে সেইখানেই পরলোক গমন করেন। ইহা আনুমানিক ১০৫৩ খৃষ্টাব্দের কথা।

পাল এবং সেন রাজাদের রাজত্বকালে বাংলাদেশের সহিত বহির্ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্বন্ধ ছিল। বাংলার প্রাচীন বন্দর **তাম্রলিপ্ত** শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলার সহিত বাহিরের এই যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, নবম শতাব্দীর মধ্যভাগেই তাম্রলিপ্ত বন্দরের গৌরব প্রায় অস্তমিত হইয়াছে। তবুও ইহার পর যে বাঙ্গালীরা বহির্ভারতে কর্ম্মচঞ্চল জীবন যাপন করিয়াছে তাহার প্রমাণ দুর্লভ নহে।

মুসলমান যুগের পূর্ব্বে বাঙ্গালী—বাংলাদেশে মুসলমানগণের আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা আহার-বিহার এবং সাজসজ্জা কিরূপে

করিত, তাহার চিত্র সাহিত্যে এবং মূর্ত্তিশিল্পে প্রতিফলিত হইয়াছে। একজন প্রাচীন লেখক বলিয়াছেন, "যে স্ত্রী নিত্য কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়া-ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল এবং নালিতা শাক পরিবেষণ করিতে পারেন, তাঁহার স্বামী পুণ্যবান।" বিবাহ ভোজে মাছের ব্যঞ্জন, মাংস, প্রচুর মশলাযুক্ত তরকারী, সুমিষ্ট পিষ্টক, দই, পায়স, ক্ষীর, কর্পূরমিশ্রিত সুগন্ধি জল ও মশলাযুক্ত পানের খিলি পরিবেষিত হওয়ার বিবরণ আছে। প্রাচীন সাহিত্যে বাঙ্গালীদের ডাল খাওয়ার বিবরণ নাই। কিন্তু **ইলিশমাছ** ও শুঁটকি মাছের বহুল প্রচলনের কথা লেখা আছে। তরিতরকারীর মধ্যে ছিল বেগুন, লাউ, কুমড়া, কচু, ঝিঙে প্রভৃতি ; ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, ইক্ষু, কলা, তাল প্রভৃতি ছিল প্রিয়। সুতরাং দীর্ঘকালের মধ্যে বাঙ্গালীর খাদ্য-তালিকার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

এখনকার মত প্রাক্-মুসলমান যুগেও ধুতি এবং শাড়ীই ছিল বাঙ্গালীর সাধারণ পরিধেয়। ইহার উপর অবস্থাপন্ন পুরুষেরা ব্যবহার করিতেন উত্তরীয়, নারীরা ওড়না। পুরুষেরা সাধারণতঃ বাবরীচুল রাখিতেন, কিন্তু নারীদের লম্বমান কুন্তলদাম খোঁপা করিয়া ঘাড়ের উপর বাঁধা থাকিত। ফিতাবিহীন জুতা এবং কাষ্ঠ পাদুকার ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালী নারীরা সাধারণতঃ ছিলেন শ্যামাঙ্গী। তাঁহারা কপালে দিতেন কাজলের টিপ, পায়ে দিতেন আলতা, ঠোঁটে সিঁদূর, খোঁপায় দিতেন ফুল। সেকালের নরনারী উভয়েই কর্ণকুণ্ডল ও কর্ণাঙ্গুরী, কণ্ঠহার, বলয়, কেয়ুর, মেখলা প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। ধনবতী মহিলাদের অলঙ্কার ছিল মণিমুক্তাখচিত। সেখানে সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকেদের

শিকার বা মৃগয়াতে ছিল প্রধান আনন্দ। নারীদের জলক্রীড়া ও উদ্যান রচনা ছিল আনন্দ ও ব্যায়াম। এতদ্ব্যতীত পাশা ও দাবা-খেলা, জুয়াখেলা প্রভৃতিরও প্রচলন ছিল। বাঙ্গালী নর-নারী সঙ্গীতে খুব ভক্ত ছিলেন। অনেক নারী নৃত্যগীত এবং বাদ্যে সুনিপুণা ছিলেন। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, কাঁসর, করতাল ও ঢাকের প্রচলন ছিল।

মুসলমান যুগের বঙ্গদেশ—বখতিয়ার খিলজী বঙ্গদেশের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়া উহা দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তভু ক্ত করেন। সে-কথা একটু পূর্ব্বেই শুনিয়াছ। কিন্তু এই অধিকার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। সুলতান বলবনের উত্তরাধিকারিগণের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া বাংলার শাসনকর্ত্তাগণ কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়া বসিলেন। এই স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে দুইটি বংশ বিখ্যাত, একটির স্থাপয়িতা সামসুদ্দীন ইলিয়াস্ শাহ্, অপরটির স্থাপয়িতা হুসেন শাহ্।

ইলিয়াস্ শাহ্ সমগ্র বঙ্গদেশের অধিপতি হইলে দিল্লীর সম্রাট্ ফিরুজ শাহ্ তুঘলক তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে রওনা হইলেন। ইলিয়াস্ শাহ্ একডালিয়া দুর্গে অবরুদ্ধ হইলেন। সরকারী ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, বিজয়ের মুহূর্ত্তে শত্রুনারীর করুণ রোদনে বিচলিত হইয়া ফিরুজ শাহ্ দিল্লী ফিরিয়া গেলেন। এই বংশের সুলতান **গিয়াসুদ্দীন** বিখ্যাত ফার্সী কবি হাফিজের সহিত পত্রালাপ করিতেন। ইহার কিছুকাল পরে তাতুরিয়া এবং দিনাজপুরের রাজা **গণেশ** বাংলার শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য জৌনপুরের অধিপতি বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে আসিলে গণেশ নিজ পুত্রকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া

তাঁহার কোপানল হইতে রক্ষা পান। পরে আবার তাঁহাকে শুদ্ধি করিয়া হিন্দু করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু পুত্র প্রাপ্ত যৌবনে মুসলমানরূপেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্ত্তী অকর্ম্মণ্য সুলতানের অত্যাচারে সকলে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন একজন অমাত্য বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করিয়া সিংহাসন দখল করেন। ইনিই হইলেন **হুসেন শাহ্**। রাজা গণেশের পরবর্ত্তী সুলতানদের আমলে আবিসিনীয় ক্রীতদাস ও চক্রান্তকারীরা বাংলার রাজনৈতিক জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং হুসেন শাহ্ তাহাদের অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ কীর্ত্তিমান ও প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন, অনেক কর্ম্মদক্ষ হিন্দুকে তিনি উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োগ কয়িয়াছিলেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ সম-সাময়িক হিন্দুগণ শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া তাঁহার প্রশস্তি গাহিয়াছেন। ইহার প্রায় ১০০ বৎসর পরে আকবর বাদশাহ বঙ্গদেশ বিজয় করেন।

মুসলমান যুগে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি—এক শতাব্দী-ব্যাপী রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তের পর, হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পর বন্ধু-ভাবে বাস করিতে অভ্যস্ত হইলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দূর ভাগ্যাকাশের সীমান্তে হিন্দুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তারা ডুবিয়া যাইতেছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে স্বীয় পল্লীবাস দামুন্যা পরিত্যাগ করিয়া যান। তিনি লিখিয়াছেন, "অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মামুদ সরিফ।"

রাজধর্ম্ম এবং রাজকার্য্য মুসলমানদের সামাজিক মর্য্যাদা ও স্বাচ্ছন্দ্য যে অনেকাংশে বাড়াইয়া দিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দুদের মধ্যে অনেকে বিজেতাগণের জীবন-যাপন প্রণালী গ্রহণ করিল। মুসলমানী ছাঁটের শ্মশ্রু ও পোষাকে সজ্জিত হইয়া অভিজাত সম্প্রদায় ফার্সী কথা বলিতে অভ্যস্ত হইল। মুসলমানেরাও অনেকে আবার হিন্দুর আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিল। পারস্পরিক এই শ্রদ্ধা হইতেই সত্যপীরের (সত্য সাধু) পূজার উদ্ভব হইল।

বাংলার মুসলমান শাসনকর্ত্তারা বাংলা ভাষার প্রতি উদাসীন ছিলেন না। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির (মিথিলার অধিবাসী) অপূর্ব্ব গীতিকা নূতন এক কাব্যলোক সৃষ্টি করিল। সুলতান নসরৎ শাহের আদেশে মহাভারত বাংলায় অনূদিত হইল। কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মালাধর বসুর ভাগবত অনুবাদ সুলতানী আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। এতদ্ব্যতীত 'চৈতন্যচরিতামৃত,' কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' সুলতানী আমলের শেষ যুগকে এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

এই সময়ে বাংলাদেশের টোলগুলিও ন্যায়চর্চ্চার জন্য বিপুল খ্যাতিলাভ করে। ইহার পীঠস্থান ছিল নবদ্বীপ। এখানে বিশিষ্ট অধ্যাপকগণের নিকট নব্য ন্যায়দর্শন শিক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্র আসিত।

এই সমস্ত টোলগুলি ছিল সে যুগের সংস্কৃত শিক্ষার একমাত্র উপায়। সাধারণ ছাত্রদের এখানে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের সহিত বিদ্যাভ্যাস কারতে হইত। কোনরূপ বিলাসিতা যেন তাহাদের স্পর্শ করিতে না পারে সেজন্য তাহাদের আসবাবপত্রের মধ্যে থাকিত শুধু একটি বালিশ আর মাদুর। তাহাদের বিদ্যারম্ভ ব্যাকরণ ও শব্দার্থ

শিক্ষা হইতে সুরু হইত। তাহার পর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করিতে হইত। নব্য ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে সামান্য কিছু জ্ঞান লাভের পর অধ্যয়ন শেষ হইত।

শ্রীচৈতন্যদেব

বাংলার সুলতানী আমলের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপত্যেও রহিয়া গিয়াছে। এই সময়ের সুন্দর সুন্দর সমাধি-সৌধ ও মসজিদের মধ্যে আদিনা মস্‌জিদ, সোনা মস্‌জিদ, একলাখী সমাধিসৌধ এবং শতগম্বুজ

বিশেষ বিখ্যাত। এই সমস্ত শিল্প এবং সাহিত্য-সাধনা বাংলার সুলতানী যুগকে মহিমান্বিত করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার শ্রেষ্ঠ অবদান ও অমৃতময় ফল শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ২৪ বৎসর বয়সে সংসার পরিত্যাগ করেন। তখন বাংলার সুলতান ছিলেন হুসেন শাহ্। তাঁহার পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য লক্ষ লক্ষ ভক্তের প্রাণে প্রেমের বন্যা বহাইয়া দিয়া বাংলায় নব-জীবনের সঞ্চার করেন। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের জাতিভেদ ও অন্যান্য কঠোরতায় অনুন্নত জাতিগুলি নিষ্পেষিত হইতেছিল। বাংলায় তখন শক্তিপূজার নামে নানা বীভৎস প্রথা প্রচলিত ছিল। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদার আদর্শের স্পর্শে মানুষের চরিত্রও বহু উন্নত হইল। অস্পৃশ্যদের ভিতরে গিয়াও তিনি নাম সংকীর্ত্তন করিতেন। তাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিতর অস্পৃশ্য ও অন্যান্য হীন জাতির লোকজন নিজেদের মুক্তির নিশানা খুঁজিয়া পাইয়াছিল।
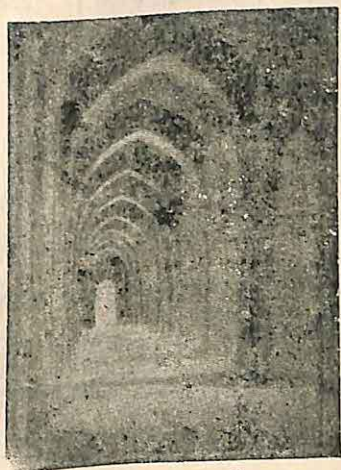
সোনা মসজিদ (গৌড়)

নূতন প্রাণের প্রাচুর্য্যে বাংলার বৈষ্ণব আদর্শ কাব্য, সাহিত্য ও জীবনকে সরস করিয়া তুলিল।

দশম অধ্যায়

মঙ্গোলদের কাহিনী ও মার্কোপোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

ইতিপূর্ব্বে বহুবার পৃথিবীতে সভ্য জগতের সহিত যাযাবরগণের তীব্র সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। কিন্তু ইউরোপের ইতিহাসে যাযাবর অভিযানের সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর অধ্যায় হইল মঙ্গোল জাতির আক্রমণ।

অপরিচয়ের অন্ধকার ভেদ করিয়া অকস্মাৎ মঙ্গোলগণ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে উল্কার মত পৃথিবীর ইতিহাসে আবির্ভূত হইল। ইহারা ছিল চীনের উত্তরাঞ্চলের আদিম বাসিন্দা এবং অশ্বারোহী যাযাবর। হুণদের জীবন-যাত্রার ন্যায় ইহাদেরও জীবন কাটিত অশ্বপৃষ্ঠে কিংবা উন্মুক্ত প্রান্তরের বুকে শত শত তাঁবুতে। পশু-মাংস ও ঘোটকীর দুগ্ধই ছিল ইহাদের প্রধান আহার্য্য। পশুচারণ, শিকার ও যুদ্ধ ছিল তাহাদের জাতীয় বৃত্তি। উত্তর রুশিয়ার বুক হইতে শীতের তুষার গলিয়া গেলে তাহারা দলে দলে ছুটিয়া যাইত সেই উত্তরাঞ্চলে। আবার শীত পড়িলেই পশুর পাল লইয়া নামিয়া আসিত দক্ষিণে। চীনের রাজবংশের সহিত ক্রমাগত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া থাকিতে থাকিতে তাহারা অজেয় রণনিপুণ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করে।

দিল্লীতে যখন দাসবংশের স্থলতানগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন এশিয়ার এই মঙ্গোল জাতির মধ্যে সহসা এক বিস্ময়কর সামরিক প্রতিভার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইনিই দুর্দ্ধর্ষ মঙ্গোল নায়ক **চিঙ্গিজ খান**। মঙ্গোলেরা হুণ অপেক্ষাও ব্যাপকভাবে সমগ্র এশিয়া ও পূর্ব্ব ইউরোপের বুকে আলোড়ন তুলিয়াছিল। সভ্য

জগতের অধিকাংশ স্থান শ্মশানে পরিণত করিয়া মঙ্গোলেরা উহার ধ্বংসস্তূপের উপর গড়িয়া তুলিয়াছিল এক বিপুলায়তন সাম্রাজ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

তাহাদের অভ্যুত্থানের সময় পশ্চিম এশিয়ার মুসলমান সাম্রাজ্যগুলি মুমূর্ষু দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মধ্য এশিয়াতে ছিল তুর্কীদের বিস্তীর্ণ **খারিজম্** বা থীবা সাম্রাজ্য। চীনের প্রতিপত্তিশালী সুঙ্ সাম্রাজ্য তখন পতনোন্মুখ। পতনোন্মুখ সুঙ্ সাম্রাজ্যের বুকে তখন মঙ্গোল ও অন্যান্য বহু বৈদেশিক শক্তি হানা দিতেছিল।

চিঙ্গিজের দিগ্বিজয়ের কাহিনী—চিঙ্গিজ খান ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মঙ্গোল জাতিকে একতাবদ্ধ করিয়া এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করিলেন। তারপর আরম্ভ হইল তাঁহার বিজয় অভিযান। মরুভূমির ঘূর্ণীবাত্যার মত তাঁহার সৈন্যবাহিনী উত্তর চীন বিধ্বস্ত করিয়া উহার রাজধানী পিকিং দখল করিল। পশ্চিম তুর্কীস্থান, পারস্য এবং আর্ম্মেনিয়াতে মঙ্গোল আক্রমণে যেন প্রলয়ের ঝড় বহিয়া গেল। মঙ্গোল বাহিনী তুষারের ঝড়, ঝঞ্ঝা, মরুভূমি, বন্যা, উত্তুঙ্গ পাহাড় পর্ব্বতের বাধা বিদীর্ণ করিয়া ভগবানের অভিশাপের মত দেশে দেশে ঝাঁপাইয়া পড়িল। **খারিজম্** বা থীবা সাম্রাজ্য নিমিষে যেন অবলুপ্ত হইল। **বোখারা, বলখ, নিশাপুর, হিরাট, তাসখন্দ** প্রভৃতি বিখ্যাত সহর নির্ম্মমভাবে বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হইল। স্থানে স্থানে মনুষ্য মস্তক দিয়া পিরামিড রচিত হইল। হিরাটে ষোল লক্ষ শবদেহ পড়িয়া রহিল। **নেসা** শহরে সত্তর হাজার নরনারী এবং শিশুকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া শায়িতাবস্থায় তীর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইল।

এই বিভৎস ধ্বংসলীলার মধ্যে সমরখন্দের শোচনীয় পরিণামই সর্ব্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক। সভ্যতা ও বাণিজ্যে সে যুগের সমরখন্দ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর ছিল। ইহার দশ লক্ষ অধিবাসীর ভিতর মাত্র পঞ্চাশ হাজার নর-নারী জীবিত ছিল। খারিজম্ বা খীবার সুলতান আত্মরক্ষার্থে ভারতের সুলতান ইলতুৎমিশের আশ্রয়প্রার্থী হন। তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে চিঙ্গিজ খানও ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে কেহ জানে না, তখন তাঁহাদের ভারত লুণ্ঠন করা ঘটিয়া উঠে নাই। সে কাহিনী আগের অধ্যায়েই তোমরা পড়িয়াছ। ইহা আশ্চর্য্য নয় যে, চিঙ্গিজ খানের এইরূপ হিংস্রতা লোকে দেখিয়া বলিত যে জন্মলগ্নে তাঁহার হাতে ছিল একটি রক্তপিণ্ড। এইরূপে মধ্য এশিয়ায় শত শত বৎসর ধরিয়া যে সভ্যতা অনির্ব্বাণ শিখায় জ্বলিতেছিল, চিঙ্গিজ খানের এক ফুৎকারে তাহা নিবিয়া গেল। ইহার পর মঙ্গোল বাহিনী (১২২২ খৃষ্টাব্দে) দক্ষিণ রুশিয়ায় ঢুকিয়া পড়িল। কীভের গ্র্যাণ্ড ডিউক বাধা দিতে যাইয়া নীপার উপত্যকায় পরাজিত ও বন্দী হইলেন। অবশেষে ১২২৭ খৃষ্টাব্দে চীনে যুদ্ধ করিবার সময় বিজয় মুহূর্তে চিঙ্গিজ খানের মৃত্যু হয়।

চিঙ্গিজ খান

তখন তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর হইতে পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ধর্ম্মের স্বাধীনতা বিদ্যমান ছিল।

নির্ম্মম, রণলিপ্সু, দিগ্বিজয়ী হইলেও চিঙ্গিজ খানকে বর্ব্বর মনে করিলে ভুল করা হইবে। তাঁহার অপূর্ব্ব সংগঠন প্রতিভার সহিত সুদূরপ্রসারী কল্পনাশক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। কথিত আছে তিনি মুখে মুখে চমৎকার কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

পৃথিবীর যাযাবর প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য সাম্রাজ্যের মত ইহাও ছিল প্রথমে কয়েকটি সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রদেশে বিভক্ত। সম্রাট্ নিজে ছিলেন ইহার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এবং প্রজাসাধারণের সহিত তাঁহার শুধু খাজনার সম্বন্ধ ছিল।

চিঙ্গিজ খানের অভিযানের সহচর ছিলেন তদানীন্তন চীনের একটি রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত **ইয়েলু চুৎসাই**। তাঁহারই নির্দ্দেশিত পন্থায় চিঙ্গিজ খানের দিগ্বিজয় ও শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হইত। চিঙ্গিজ খানের মৃত্যুর পরও বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার শাসন ব্যবস্থা মঙ্গোল সাম্রাজ্যে অব্যাহত ছিল। প্রভুর বর্ব্বর হিংস্রতার মুখে অনিবার্য্য ধ্বংসের হাত হইতে বহু নগরীকে চুৎসাই রক্ষা করিয়াছিলেন। পরাজিত নগরের বহু দুর্ল্লভ পুঁথিপত্র, শিলালিপি সংগ্রহ করিয়া তিনি ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকদের উপকার করিয়া গিয়াছেন। একবার তাঁহার বিরুদ্ধে ওমরাহ্গণের গভীর চক্রান্ত হয়। চক্রান্তকারীরা দুর্নীতির অপরাধে তাঁহার বিচার করে। কিন্তু বিচার শেষে দেখা গেল, যথাসর্ব্বস্ব বলিতে চুৎসাই-এর কয়েকটি নথীপত্র ও গান-বাজনার যন্ত্র ব্যতীত আর কিছু ছিল না।

কিভ
তুর্কীস্থান
পামীর
মঙ্গোলিয়া
পিকিং
পারস্য
আরব দেশ
ভারতবর্ষ
---- চিঙ্গিজ খানের সাম্রাজ্য
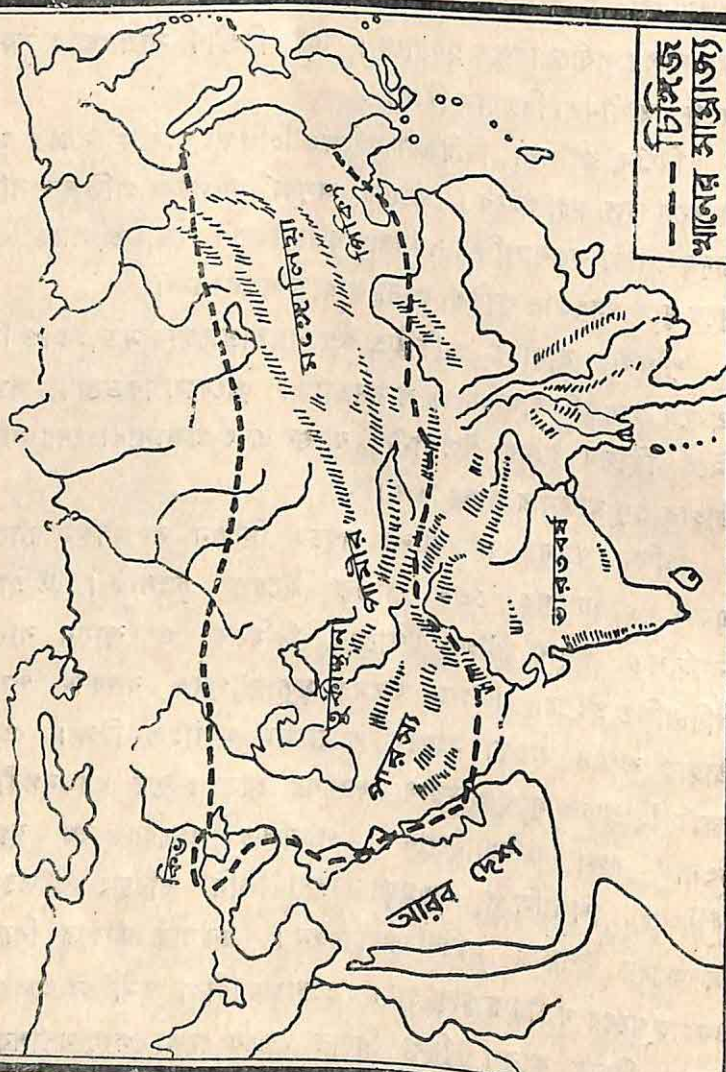
চিঙ্গিজের উত্তরাধিকারিগণ—চিঙ্গিজের উত্তরাধিকারিগণও ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। তাঁহাদের নেতৃত্বে মঙ্গোল বাহিনী সমগ্র চীনদেশ অধিকার করিল।

পারস্য, সিরিয়া ও রুশিয়ার বৃহৎ অংশও তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। কথিত আছে, তাঁহার বংশধর বাটু খানই যুদ্ধে প্রথম কামান ও গোলাবারুদ ব্যবহার করেন।

বাটু খান

চিঙ্গিজ খানের পৌত্র **হলাগু খান** একবার যুদ্ধে যাইবার সময় বাগদাদের খলিফার সাহায্য চাহিয়াছিলেন। কিন্তু খলিফা কোন সাহায্য না দিয়া বরঞ্চ হলাগু খানকে অপমানিত করেন। ইহাতে হলাগু খান লক্ষ লক্ষ সৈন্য লইয়া বাগদাদ সহরটি অবরোধ করেন। মঙ্গোল সৈন্যের অবরোধের পূর্ব্বে খলিফার সৈন্যদল কিছু বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। চল্লিশদিন অবরোধের পর যুদ্ধ করা বৃথা বিবেচনা করিয়া খলিফা হলাগুর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ইহার পরদিন মঙ্গোল নেতা বাগদাদ ধ্বংসে প্রবৃত্ত হন। কোরাণ হস্তে করিয়া নারী ও শিশু আশ্রয়প্রার্থিগণ নগরের বাহিরে আসিবামাত্রই অশ্বক্ষুরতলে পিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। সহস্র সহস্র রূপলাবণ্যবতী বিলাসিনীদের উন্মুক্ত রাজপথে সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনার সম্মুখীন হইতে হইল। পারসিক সভ্যতার শেষ চিহ্ন, এত দিনের সংগৃহীত শিল্প ও সাহিত্যের

নিদর্শন মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল। তিন দিন ধরিয়া পূর্ণোদ্যমে বাগদাদ সহরে হত্যার তাণ্ডবলীলা চলিয়াছিল। কয়েক মাইলব্যাপী টাইগ্রীস নদীর জল সেই নররক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সোনা ও হীরা জহরতের লোভে রাজপ্রাসাদ হইতে মসজিদ পর্য্যন্ত সমস্ত অট্টালিকা ধূলিসাৎ করিয়া দেওয়া হয়। সেই হত্যাকাণ্ডে হাসপাতালের রোগী কিংবা বিদ্যালয়ের ছাত্র কেহই রক্ষা পায় নাই। এইরূপে আরব্যোপন্যাসের স্বপ্নরাজ্য, মুসলমান সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ শ্মশানে পরিণত হইল।

এই বিস্ময়কর মঙ্গোল বিজয়ের পিছনে ছিল দীর্ঘ সামরিক সাধনা। সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্তী রাজ্য ও সহর আক্রমণ করিলেও তাহারা পূর্ব্বেই গুপ্তচরদ্বারা সমস্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংগ্রহ করিত; তারপরে আরম্ভ হইত নির্ম্মম আক্রমণ। মোটকথা সামরিক বিজ্ঞান, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বে তাহারা মধ্য ইউরোপের সেনাপতিগণ অপেক্ষা বহু অগ্রগামী ছিল।

বাগদাদ ধ্বংসের প্রায় সমসাময়িক কালে হলাগুর ভ্রাতা **কুবলাই খান** মঙ্গোলদের অধিপতি হইয়াছিলেন। চীন ছিল তাঁহার ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল। সেই সময় মঙ্গোলদের অন্যান্য নায়কেরাও এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থলে অর্দ্ধ-স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিলেন। এই সুদূরপ্রসারী দিগ্বিজয়ের ফলে মঙ্গোলেরা ইতিহাসের বৃহত্তম সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করিল। কিছুদিনের জন্য তাহাদের সাম্রাজ্যের অধীনে ইউরোপ ও এশিয়ার বাণিজ্য পথগুলি বাধা-বন্ধনহীন ভাবে উন্মুক্ত হইল। তাঁহাদের রাজধানীতে আসিতে লাগিল—দলে দলে ধর্ম্মপ্রচারক, পণ্ডিত, সদাগর, বিভিন্ন দেশের

কারিগর। ইউরোপের বাইজানটাইন সাম্রাজ্য, আরব দেশ, পারস্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থান হইতে অসংখ্য লোক আসিতে লাগিল। মঙ্গোল রাজধানী যেন এশিয়ার তীর্থস্থান হইয়া দাঁড়াইল। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে জ্ঞানেরও প্রসার হইল।

কুবলাই খান

সে যুগের কোন ধর্ম্মমত সম্পর্কেই মঙ্গোলেরা বিরূপ মত পোষণ করিত না। তাহারা ইস্‌লাম অপেক্ষা খৃষ্টান মতবাদকেই বেশী পছন্দ করিত। কুবলাই খান সিংহাসনে উপবেশন করিয়া খৃষ্টানদের ধর্ম্মগুরু পোপকে কয়েকজন দর্ম্ম-প্রচারক পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানান। তখন ইউরোপে পোপের অত্যন্ত দুরবস্থা চলিতেছিল। কয়েক বৎসর সে-অনুরোধ রক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অবশেষে একজন পোপ দুইজন সাধারণ ধর্ম্ম-প্রচারককে কুবলাই খানের দরবারে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারাও শেষ পর্য্যন্ত পথের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ করিবার জন্য কুবলাই খান যাহাদের হাতে সংবাদ প্রেরণ করেন, তাঁহারা ছিলেন ভেনিসের পোলো উপাধিধারী দুই ভাই। তাঁহাদের বিখ্যাত সওদাগরী ব্যবসা

ছিল। কন্‌ষ্টান্‌টিনোপলে তাঁহাদের কারবার ছিল। ব্যবসা উপলক্ষ্যে তাঁহারা রুশিয়ার দক্ষিণে **ক্রিমিয়া** ও তথা হইতে কাজানে যান। কাজান হইতে তাঁহারা যান **বোখারায়**। সেখানে কুবলাই খানের একদল প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাদের একান্ত অনুগ্রহে তাঁহারা কুবলাই খানের দরবারে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের হাত দিয়া কুবলাই খান পোপের নিকট অনুরোধ পাঠাইয়াছিলেন—"এমন সপ্তশিল্পে পণ্ডিত ও তীক্ষ্ণধী একশত জন ধর্ম্মগুরু ও পণ্ডিত প্রেরণ করিবেন, যাঁহারা পৌত্তলিকদের তর্কে পরাজিত করিয়া প্রভু যীশুর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন।"

একটু আগেই বলিয়াছি, পোপের পক্ষে সে অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। মাত্র দুইজন সাধু সঙ্গে পোলো-ভ্রাতৃদ্বয় রওনা হইয়াছিলেন; সঙ্গে লইয়াছিলেন কিশোর মার্কোপোলোকে।

কুবলাই খান ইউরোপ হইতে ফিরিবার পথে তাঁহাদের কয়েকটি সখের দ্রব্য আনিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহার ভিতর একটি অনুরোধ ছিল—প্যালেষ্টাইনে যীশুখৃষ্টের পবিত্র সমাধিতে যে অনির্ব্বাণ বাতি জ্বলে, তাহার আধার হইতে একটু তৈল। সেজন্য এবার তাঁহারা পূর্ব্ব-বর্ণিত পথে না গিয়া প্যালেষ্টাইনের পথে যাত্রা সুরু করেন। কুবলাই খানের সোনার পাঞ্জা তাঁহাদের নিকট থাকায় কোথাও তাঁহাদের কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই।

তথা হইতে তাঁহারা যান **আর্ম্মেনিয়াতে**। ইহার পর মেসোপোটেমিয়ার পথে তাঁহারা পারস্য উপসাগরের তীরে **অরমুজ** সহরে উপনীত হন। অরমুজে বহু ভারতীয় ব্যবসায়ীর সহিত

তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। তাহার পর পারস্য মরুভূমির ভিতর দিয়া **বল্‌খ প্রদেশ** এবং পামীর হইয়া **খাশগর** এবং সেখান হইতে **খোটান, লবনর** অতিক্রম করিয়া হোয়াংহো উপত্যকা দিয়া তাঁহারা অবশেষে পিকিংএ গিয়া উপস্থিত হন।

পিকিংএ উপস্থিত হইলে কুবলাই খান তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি রাখেন নাই। দলের ভিতর তরুণ মার্কোপোলোই তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

মার্কোপোলো কুবলাই খানের খুব প্রিয়পাত্র হইয়া চীনদেশে ১৭ বৎসর (১২৭৫—৯১ খৃঃ) থাকেন এবং একটি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হন। তিনি সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে চীনের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অবশেষে গৃহে ফিরিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং ফিরিবার একটি সুযোগও উপস্থিত হইল।

পারস্যের মঙ্গোল রাজার তখন স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল। কুবলাই খান মার্কোপোলোর তত্ত্বাবধানে তাঁহার বিবাহের জন্য একজন মঙ্গোল রাজকুমারীকে পারস্যে প্রেরণ করেন। মার্কোপোলো এবং তাঁহার সহযাত্রিগণ সুমাত্রা, ভারতবর্ষ এবং পারস্য ঘুরিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। দীর্ঘ প্রবাসের পর তাতার বেশে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে কেহ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিল না। অবশেষে এক বিরাট ভোজসভায় তাঁহারা জীর্ণ তাতার পরিচ্ছদের ভিতর হইতে অজস্র মণি, মুক্তা, হীরা, জহরৎ বাহির করিলে অভ্যাগতদের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তবুও লোকে অনেকদিন পর্য্যন্ত পোলোদের ভ্রমণ-কাহিনী আজগুবি বলিয়া মনে করিত।

তাঁহারা চীন হইতে ফিরিবার বহুকাল পরে, জেনোয়া ও ভেনিসের মধ্যে সমুদ্র-পথের প্রাধান্য লইয়া তীব্র সংগ্রাম হইয়াছিল। ভেনিসীয়গণ সে যুদ্ধে পরাজিত হয়। মার্কোপোলোও অন্যান্য ভেনিসীয়দের ন্যায় জেনোয়াবাসীদের হস্তে বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সেই দীর্ঘ কারাবাসের একঘেয়েমী: কাটাইবার নিমিত্ত মার্কোপোলো তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী অন্যান্য বন্দীদের শুনাইতেন। সেই কাহিনী আর একজন বন্দী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া আমরা এ অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি। মার্কোপোলোর ভ্রমণ-কাহিনী ইউরোপের নবযুগ প্রবর্ত্তনের পথে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী হইতে তদানীন্তন চীন ও পৃথিবীর বহু দেশের অবস্থা জানিতে পারা যায়।

মার্কোপোলো

মার্কোপোলো পিকিং সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উহার চারিদিকে ঘিরিয়া ছিল মাটির উচ্চ প্রাচীর; উহাতে ১২টি সিংহদ্বার ছিল। সহরের অভ্যন্তরে প্রাসাদোপম অট্টালিকা ছিল। সম্রাট্ কোন স্থান পরিদর্শন করিতে গেলে সেখানে অসংখ্য তাঁবু পড়িত। সম্রাটের দরবার যে তাঁবুতে বসিত তাহা এত বিশাল ছিল যে, সেখানে এক হাজার সর্দ্দার বসিতে পারিতেন। তখন দেশের সম্পদও ছিল

কল্পনাতীত। পান্থশালা, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, উদ্যান, শস্য-শ্যামল প্রান্তর, বৌদ্ধমঠ, সমৃদ্ধিশালী নগর-নগরী মঙ্গোল সাম্রাজ্যকে দিয়াছিল অপূর্ব্ব শ্রী।

দক্ষিণ চীনের যেখানে মার্কোপোলো শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সেই হ্যাঙচাউ-এর ঐশ্বর্য্যের কথাও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানকার ইষ্টক নির্ম্মিত প্রশস্ত রাস্তা, সুদীর্ঘ খাল, ১২০০ ফিট উচ্চ সেতু, বিশাল বাজার এবং অসংখ্য দোকানপাটের সমারোহ এক বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় বণিকদের ইষ্টক নির্ম্মিত গুদামঘর, জনসাধারণের জন্য অসংখ্য স্নানাগার, বিলাসী নরনারীর জন্য সূক্ষ্ম বস্ত্র ও স্বর্ণসম্ভার লোকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করিত। মার্কোপোলো বর্ম্মাদেশের বিরাট সৈন্যবাহিনী ও রণহস্তী, জাপানের রত্নৈশ্বর্য্য, দক্ষিণ ভারতের এক রাণী ও যোগীর কথাও তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বর্ণনা করিয়াছেন।

মঙ্গোল সম্রাট্ তাইমুর—চিঙ্গিজ খানের মৃত্যুর প্রায় দেড়শত বৎসর পরে আর একজন মঙ্গোল বীর মঙ্গোল সাম্রাজ্যের অস্তমিত মহিমা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহার নাম তাইমুর। তিনি ভারতীয় মুঘল সম্রাট্‌দের পূর্বপুরুষ। তাঁহার ধমনীতেও চিঙ্গিজের মঙ্গোল রক্ত প্রবাহিত হইত। তাইমুর প্রথমে সমরখন্দের রাজা হন। তাঁহারও হিংস্রতার তুলনা ছিল না। চিঙ্গিজের মত তিনিও মানুষের মাথা দিয়া নগরে নগরে গড়িয়াছিলেন পিরামিড, দিল্লীকে করিয়াছিলেন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। দেশ-দেশান্তর তিনি ছারখার করিয়াছেন, কিন্তু চিঙ্গিজের যে-সাম্রাজ্য দুঃস্বপ্নের মত মিলাইয়া গিয়াছিল, তাহা আর ফিরাইয়া আনিবার সাধ্য তাঁহার হয় নাই।

একাদশ অধ্যায়

অটোম্যান তুর্কী ও কন্‌ষ্টান্‌টিনোপলের পতন

যখন মঙ্গোল নেতা চিঙ্গিজ খান দুরন্তবেগে অশ্বারোহী বাহিনী লইয়া মধ্য এশিয়ায় ত্রাসের সঞ্চার করিতেছিলেন, তখন একটি ক্ষুদ্র তুর্কীজাতি সে আক্রমণের মুখে দেশ হইতে দেশান্তরে পলাইয়া কোনও রকমে প্রাণরক্ষা করিতেছিল। কখনো খৃষ্টান অঞ্চলের ধর্ম্মযুদ্ধ, কখনো বা মুসলমানদের জেহাদ ঘোষণার মধ্যেই তাহারা একরাজ্য হইতে অন্যরাজ্যে কিংবা সাম্রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছে। দুস্তর মরু, দুর্গম পর্ব্বত ডিঙ্গাইয়া বিদেশী রাজ্যের মধ্য দিয়া কি করিয়া যে তাহারা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন লইয়া সামান্য একটু মাথা গুঁজিবার আশ্রয়ের আশায় উর্দ্ধশ্বাসে ছুটাছুটি করিত, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

অবশেষে তাহারা এশিয়া-মাইনরের মালভূমির উপর আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। অঞ্চলটি ছিল তুর্কীদের অধীনস্থ একটি রাজ্য—আনাতোলিয়া। ঐ দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই তখন ছিল ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী। তুর্কী ভাষায় তাহারা কথা বলিত। তবে সেই সময় তাহাদের ভিতর একটি বড় অংশ ছিল গ্রীক, ইহুদী ও আর্ম্মেনীয় জাতির লোক। এই ভ্রাম্যমাণ ক্ষুদ্র জাতিটিই হইল **অটোম্যান তুর্কী**। তাহাদের নেতা **ওসমান**-এর নাম হইতেই গোষ্ঠীটির ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। ওসমান নামটি আরবীতে ওথ্‌ম্যানরূপে লিখিত হয়। তাহা হইতে পাশ্চাত্ত্যের লোকজন তাহাদের অটোম্যান বলিত।

ক্রমে ক্রমে এই অখ্যাত অজ্ঞাত গোষ্ঠীই অন্যের অলক্ষ্যে ঐ অঞ্চলে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বসিল। ইতিপূর্ব্বে তোমরা **সেলজুক** তুর্কীদের সাম্রাজ্যের কথা পড়িয়াছ। সেই পতনোন্মুখ সেলজুক সাম্রাজ্যের মধ্যে তাহারাই প্রধান বলিয়া গণ্য হইল। পূর্ব্বে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌ষ্টান্‌টিনোপলের সহিত তাহাদের সর্ব্বদা শত্রুতা চলিতেছিল। এইবার যুদ্ধের রক্ত-পিচ্ছিল পথ ধরিয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে ম্যাসিডোনিয়া, এপিরাস, যুগোশ্লোভিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে আপনার প্রভাব বিস্তার করিল।

বুলগেরিয়া, যুগোশ্লোভিয়া প্রভৃতি দেশে আসিয়া তুর্কীগণ খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী গোষ্ঠীর সম্মুখীন হইল। ঐ সমস্ত অঞ্চলে তুর্কী আধিপত্য ছিল বলিয়া অধিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালীও অনেকাংশে তাহাদের অনুরূপ ছিল, কিন্তু তাহাদের ভিতর একতা বলিয়া কিছুই ছিল না। অথচ অটোম্যান তুর্কীরা ছিল ঐক্যবদ্ধ মুসলমান জাতি। যুদ্ধবিদ্যাতেও তাহারা ছিল শ্রেষ্ঠ। পরাজিত খৃষ্টানদের অনেককেই তাহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করে ও মুসলমান ছাড়া অন্যদের ঘাড়ে করের বোঝা চাপাইয়া দেয়। ক্রমে অটোম্যান সাম্রাজ্যের সীমা পূর্ব্বে এশিয়া-মাইনরের তরাস পর্ব্বত হইতে পশ্চিমে হাঙ্গেরী ও রুমানিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। তাহাদের প্রধান নগরী হইল **এ্যাড্রিয়ানোপল**।

অটোম্যানদের উন্নতির মুখেই তৈমুরলঙের সেনাবাহিনী তাহাদের উপর এক অতি কঠিন আঘাত হানিয়াছিল। আনাতোলিয়ার একটি বিরাট অংশ ধ্বংস করিয়া তবে তৈমুর নিরস্ত হন। তৈমুরের

আক্রমণের পর প্রায় বিশ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় অটোম্যান স্থলতানেরা তাঁহাদের অপহৃত গৌরব অনেকাংশে পুনরুদ্ধার করিলেন।

অটোম্যান স্থলতানদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় স্থলতানদের কার্য-ক্ষমতা, সেনাপতিদের কৃতিত্ব এবং **জানিসেরিস** নামক সৈন্যবাহিনীর অবদান যথেষ্ট ছিল। বৎসরে এক হাজার করিয়া খৃষ্টান তরুণদের এই বাহিনীতে ভর্ত্তি করা হইত। তাহাদের ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাহারা সকলেই ছিল **বেকতাশী** নামে একটি দরবেশ সম্প্রদায়ভুক্ত। ঐ সম্প্রদায়ের নানা গুপ্তবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ ছিল এবং তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল প্রবল। ঐ বাহিনীর সৈন্যদের বেতনের হার ছিল উচ্চ, শৃঙ্খলাবোধ তীব্র। দেশপ্রেমে উন্মত্ত এই পদাতিক বাহিনীই ছিল অটোম্যান সেনাদলের মেরুদণ্ডসদৃশ।

বাইজানটাইন রাজ্যের শাসকগণ রোমের পোপের অপেক্ষা তুর্কীদের সহিত সহজে বোঝাপড়া করিতে পারিতেন। বহু বৎসর ধরিয়া উভয় রাজ্যের অধিবাসীদের ভিতর বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু বাইজানটাইন সাম্রাজ্য ও উহার প্রাণকেন্দ্র কন্‌ষ্টান্‌টিনোপল অধিকার না করা পর্য্যন্ত যেন অটোম্যানদের সামরিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতে চাহিল না।

প্রায় এক সহস্র বৎসর ধরিয়া কন্‌ষ্টান্‌টিনোপল ইউরোপের সিংহদ্বার রক্ষা করিতেছিল। ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামরিক বিপ্লবের মুখেও ইহা ছিল অচল-অটল। অটোম্যান তুর্কীদের অভ্যুদয় এবং সাম্রাজ্য বিস্তার এইবার বাইজানটাইন সম্রাট্‌দের অটল আসন কম্পিত করিয়া তুলিল। এশিয়া ও ইউরোপের

সঙ্গম-তীর্থস্থলে অবস্থিত কনষ্টান্‌টিনোপল সহর ছিল স্বভাব-সুরক্ষিত। সম্রাট্‌দের সামরিক ব্যবস্থায় ইহা প্রায় দুর্ভেদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অটোম্যানগণ কর্ত্তৃক ইহা অধিকার করিবার প্রথম দুইবারের প্রয়াস তাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। কিন্তু তুর্কীরা হতোদ্যম না হইয়া শেষবারের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

তখন তুর্কীদের সুলতান ছিলেন **দ্বিতীয় মহম্মদ**। ইতিহাস তাঁহাকে "মহানুভব" আখ্যা দিয়াছে। মহম্মদ বিপুল নৌ ও স্থলবাহিনী লইয়া কনষ্টান্‌টিনোপল আক্রমণ করিলেন। দিনের পর দিন কামানের মুখ হইতে পাথরের গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাসাদের উপর ও রাজপথে শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। শরজালে কনষ্টান্‌টিনোপলের আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কিন্তু তবুও নগররক্ষীরা পরাজয় স্বীকার করিল না। গ্রীক আগুন ও বোমা দিয়া তাহারা প্রাণপণে নগর রক্ষা করিতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তুর্কীরা অবশেষে একটি খাল খনন করিল। খাল গিয়া থামিল নগর-প্রাচীরের গায়ে। সহসা একদিন সুপ্ত নগরবাসী ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল, বড় বড় রণপোত নগর-প্রাচীরের গায়ে লাগিয়াছে। দলে দলে তুর্কী সৈন্য রণপোত হইতে সহর আক্রমণ করিল। স্থলবাহিনীও বিপুল বিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রাচীরের অরক্ষিত অংশ বিদীর্ণ করিয়া বন্যাপ্রবাহের মত তাহারা নগরে প্রবেশ করিল। সম্রাট্ নিহত হইলেন। অসহায় নরনারী সেণ্ট্ সোফিয়া গীর্জ্জায় আশ্রয় লইল। সেইখানে বিশাল গম্বুজতলে বসিয়া প্রাচীন ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হইবার আশায় ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী ভাবিতেছিল,

অটোমান সাম্রাজ্য
(ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী)
০ ২০০ ৪০০
মাইল
ভিয়েনা
হাঙ্গেরী
ওয়ালাচিয়া
দানিয়ুব নং
সার্বিয়া
বুলগেরিয়া
রুমেলিয়া
ক্রিমিয়া
কৃষ্ণ সাগর
কনস্টান্টিনোপল
ককেশাস পর্বত
এশিয়া মাইনর
(আনাটোলিয়া)
আর্মেনিয়া
পারস্য
বাগদাদ
মেসোপটেমিয়া
আলেপ্পো
সিরিয়া
দামাস্কাস
জেরুজালেম
সাইপ্রাস
ক্রীট
স্মার্ণা
গ্রীস
রোম
সিসিলি
ভূমধ্য সাগর
আলজিরিয়া
আলেকজান্দ্রিয়া
কায়রো
ত্রিপোলি
মিশর
নীল নদ
আরব
রোন নং
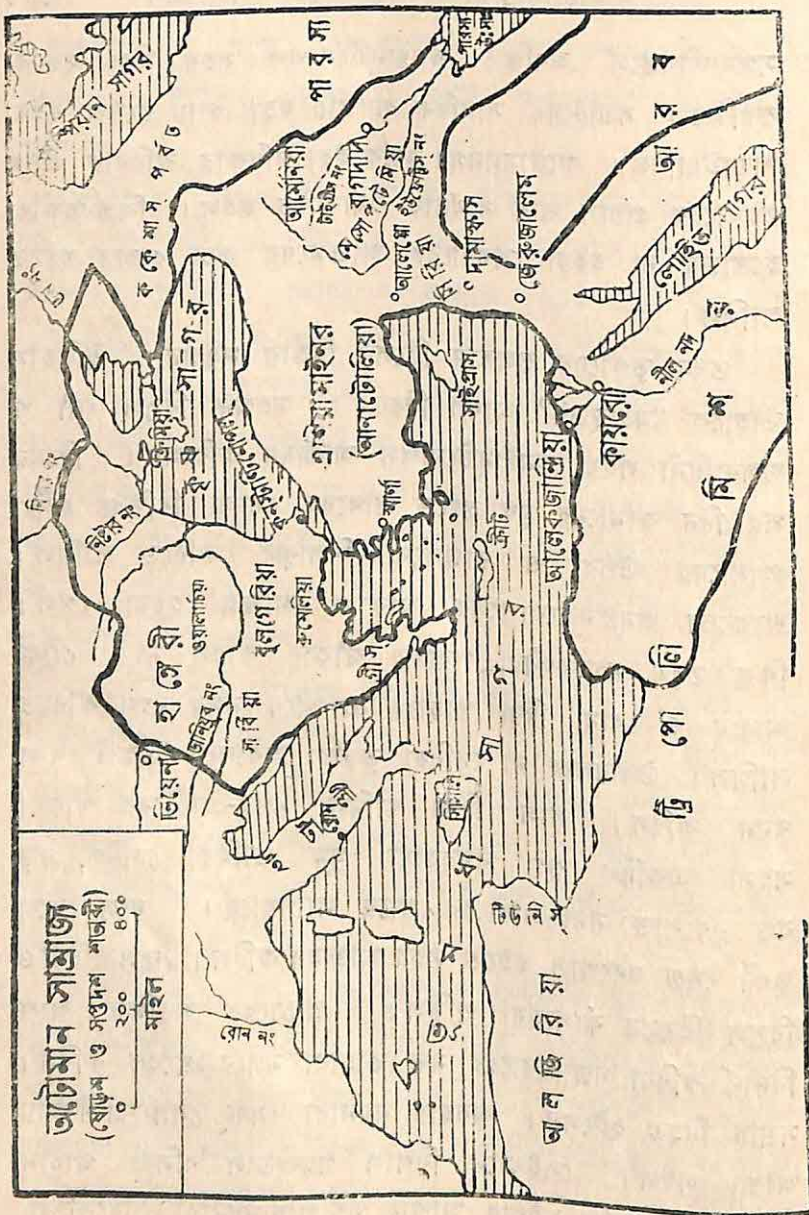
"কোথায় আজ সেই দেবদূত, যিনি শাণিত তরবারি দিয়া তুর্কীদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিবার আশা দিয়াছিলেন ?" তুর্কীরা অবশেষে নগর অধিকার করিল এবং লুণ্ঠিত নগরের গীর্জ্জার গম্বুজশীর্ষে ক্রুশ-চিহ্নের স্থলে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত পতাকা উড়াইয়া দিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেণ্ট্ সোফিয়া গীর্জ্জা মসজিদে পরিণত হইল। ইহা ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দের কথা। ইহার প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম-রোমের স্বাধীনতা বর্ব্বর আক্রমণে অবলুপ্ত হইয়াছিল।

সাম্রাজ্য বিস্তার—সুলতান মহম্মদের বিজয়ের পর অটোম্যান তুর্কীরা এশিয়া এবং ইউরোপে জাঁকিয়া বসিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুলতানগণও যুদ্ধের রক্তপিচ্ছিল পথে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া চলিলেন। তাঁহারা ইজিপ্ট, সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া, গ্রীস এবং পারস্য ও দানিয়ুব অঞ্চলের একটি বৃহৎ অংশ করতলগত করিলেন। তাহাদের চরম উন্নতিকাল সুলতান **সুলেয়মানের** সময় (১৫২০—৬৬ খৃঃ অঃ)। সমসাময়িক লোকেরা তাঁহাকে বলিত "জাঁকজমকপ্রিয়"। বেলগ্রেড দখল তাঁহার অন্যতম স্মরণীয় কীর্ত্তি। হাঙ্গেরীর উন্মুক্ত প্রান্তর তখন তাঁহার পদতলে ও সম্মুখে। মোহাক্‌সের যুদ্ধের (১৫২৬ খৃঃ অঃ) পর বুদাপেস্তও অটোম্যান তুর্কীদের কবলিত হইল। ইহার তিন বৎসর পর তুর্কীরা একেবারে ভিয়েনার প্রাচীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। কিন্তু এইখানে আসিয়া তুর্কীদের বিজয় অভিযান স্তব্ধ হইয়া গেল। সুলতান সুলেয়মানকে উদ্যত তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া ভিয়েনার উপকণ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল।

১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান **প্রথম সেলিম** ইজিপ্ট হইতে খলিফাকে বন্দী করিয়া কন্‌ষ্টান্‌টিনোপলে লইয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু সুলেয়মান

তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। কথিত আছে যে, খলিফা তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা তুর্কী সুলতানকে সমর্পণ করেন। এই কাহিনী সত্য কিনা বলা মুস্কিল। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, অটোম্যান সুলতানরা ক্রমে ক্রমে খলিফার নাম ও ক্ষমতা আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছিলেন। এইরূপে কন্‌ষ্টান্‌টিনোপলের সুলতান খলিফারূপে ইস্‌লামের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী নরপতি হইলেন। বাগদাদের খলিফা ও বাইজানটাইন সম্রাটের উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহার গৌরব ও নামমহিমা তিন মহাদেশে প্রচারিত হইল। অটোম্যান সুলতানদের চরম উন্নতিকালে তুর্কী সাম্রাজ্য পারস্য উপসাগর হইতে প্রায় পোলাণ্ডের সীমান্ত পর্য্যন্ত এবং কাস্পিয়ান সাগর হইতে আলজিরিয়ার অন্তর্গত ওরান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভূমধ্যসাগর তখন প্রায় তুর্কী হ্রদে পরিণত হইয়াছিল।

কালপঞ্জী

খৃষ্টাব্দ—

৪১০ আলারিকের মৃত্যু।

৪৫৩ এ্যাটিলার মৃত্যু।

৪৭৬ বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক পশ্চিমের রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস।

৪৯৩ অস্ট্রোগথ নেতা থিয়োডোরিকের ইটালীর সিংহাসন দখল।

৫২৭ জাষ্টিনিয়ান পূর্ব্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট্।

৫৩২ হূণ নেতা মিহিরগুল ভারতবর্ষে পরাজিত।

৫৬৫ জাষ্টিনিয়ান-এর মৃত্যু।

৫৭০ ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের জন্ম।

৬০৬ হর্ষবর্দ্ধনের সিংহাসন লাভ।

৬০৯ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী।

৬২২ হজরত মহম্মদের মদিনা গমন ও হিজিরা সনের আরম্ভ।

৬২৭ তাই-সুঙ্।

৬২৯ হিউয়েনসাঙ্-এর ভারত ভ্রমণ।

৬৩২ মহম্মদের মৃত্যু; আবুবকর—প্রথম খলিফা।

৬৩৪ ওমর—দ্বিতীয় খলিফা।

৬৪৪ ওসমান—তৃতীয় খলিফা।

৬৪৭ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু।

৬৫৬ ওসমান নিহত; আলি—চতুর্থ খলিফা।

৬৬১ আলি নিহত; মুয়াবিয়া খলিফা।

৭১২ সুয়ান সুঙ্ বা মিঙ্ হুয়াঙ্।

৭৫০ আব্বাসিয় বংশের রাজত্ব।

খৃষ্টাব্দ—

৭৭০ বঙ্গদেশের নরপতি ধর্ম্মপাল।

৭৭১ শার্লেমেনের সিংহাসনারোহণ।

৭৮৬ হারুণ-অল-রশীদ।

৮০০ শার্লেমেনের অভিষেক ; পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য।

৮১০ দেবপালদেব।

৮১৪ শার্লেমেনের মৃত্যু।

৯৬০ চীনে সুঙ্ বংশের রাজত্ব।

৯৮০ অতীশ দীপঙ্করের জন্ম।

৯৯৮ সুলতান মামুদ।

১০৭১ সেলজুক তুর্কীদের দ্বারা ইস্‌লামের পুনরভ্যুদয়।

১০৯৬ প্রথম ক্রুসেড।

১১৫৮ বল্লালসেন।

১১৬৯ সালাহুদ্দীন—ইজিপ্টের সুলতান।

১১৮৭ সালাহুদ্দীন কর্ত্তৃক জেরুজালেম অধিকার।

১১৯২ তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের পরাজয়।

১১৯৯ বখ্‌তিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়।

১২০৬ দিল্লীতে দাসবংসের রাজত্ব। চিঙ্গিজের 'খান' উপাধি গ্রহণ।

১২১১ ইল্‌তুৎমিশ।

১২১৪ চিঙ্গিজ খান কর্ত্তৃক পিকিং অধিকার।

১২২৭ চিঙ্গিজ খানের মৃত্যু।

১২৩৪ মঙ্গোলদের হস্তে কিন্ সাম্রাজ্যের পতন।

১২৩৬ রাজিয়া।

১২৪৬ নাসিরুদ্দীন।

১২৫৮ হুলাগু কর্ত্তৃক বাগদাদ ধ্বংস।

খৃষ্টাব্দ—

১২৬০ কুবলাই খান।

১২৬৫ বলবন।

১২৭১ মার্কোপোলোর ভ্রমণ আরম্ভ।

১২৯৪ কুবলাই খানের মৃত্যু।

১২৯৬ আলাউদ্দিন খিলজী।

১৩২৫ মুহম্মদ তুঘলক।

১৩৫১ ফিরুজ শাহ্ তুঘলক।

১৩৬৮ চীনে মঙ্গোল শাসন লুপ্ত, মিঙ্ বংশ।

১৩৬৯ তাইমুর লঙ্।

১৩৯৮ তাইমুরের ভারত আক্রমণ।

১৪৫৩ অটোম্যান তুর্কীদের সম্রাট্ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল বিজয়।

১৪৮৫ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম।

পরিশিষ্ট

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়ঃ

১। বর্ব্বর জাতির আক্রমণের পূর্ব্বে রোমান সাম্রাজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বর্ণনা কর।

২। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য কোন্ কোন্ বর্ব্বর জাতি আক্রমণ করিয়াছিল? তাহারা যে সকল স্থানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহা উল্লেখ কর।

৩। কোন্ গ্রন্থ পাঠ করিলে জার্মাণ আক্রমণকারীগণের বিবরণ জানিতে পারা যায়? তাহাদের আকৃতি, স্বভাব ও জীবনযাত্রার প্রণালী বর্ণনা কর।

৪। জার্ম্মাণ আক্রমণকারীগণের দেশত্যাগের কারণ কি। তাহারা কিরূপভাবে এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইত?

৫। হুণ আক্রমণকারীগণের একটি বিবরণ লিখ।

৬। বর্ব্বর জাতির আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? উহার দলাদলি বর্ণনা কর।

৭। শ্বেত হুণগণ কখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করে? তাহাদের বিখ্যাত দুইজন রাজা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৮। ভারতবর্ষ হইতে হুণ আধিপত্যের অবসান কিরূপে হইল? হুণজাতি কি এখনো ভারতবর্ষে আছে?

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

১। প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল? ইহার অবস্থান এবং সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। সাম্রাজ্যের সামরিক অবস্থা কিরূপ ছিল?

২। জাষ্টিনিয়ান কে ছিলেন? তাঁহার চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে যাহা জান বিশদভাবে বর্ণনা কর।

৩। "জাষ্টিনিয়ান সংহিতা" কি? উহার প্রভাব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। বাইজানটাইন সভ্যতা সম্বন্ধে একটি বিশদ বিবরণ দাও।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

১। শ্রীহর্ষের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল? তাঁহার রাজধানী কনৌজ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। শ্রীহর্ষ, রাজ্যশ্রী এবং শশাঙ্কের কাহিনী বর্ণনা কর।

৩। সম্রাট্ শ্রীহর্ষ কোন্ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন? এই প্রসঙ্গে কনৌজের ধর্ম-সম্মেলন এবং প্রয়াগের মহোৎসবের বর্ণনা দাও।

৪। হিউয়েনসাঙের ভ্রমণ-কাহিনীর একটি বিস্তৃত বিবরণ দাও। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া যাহা দেখিয়া গিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে লিখ।

৫। শ্রীহর্ষের সমসাময়িক কালে চীন দেশের সম্রাট্ কে ছিলেন? তিনি কিরূপে তাঙ্-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন?

৬। সম্রাট্ তাই-সুঙের চরিত্র ও কৃতিত্বের আলোচনা কর।

৭। সম্রাট্ সুয়ান-সুঙ্ সম্বন্ধে কি জান লিখ।

৮। তাঙ্-বংশের রাজত্বকালে চীনদেশের অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহা বর্ণনা কর।

৯। তাঙ্-যুগের সভ্যতা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

১। ভারতবর্ষের বাহিরে কোথায় কোথায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল?

২। মধ্য ও পূর্ব্ব-এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার প্রসার সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

৪। বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতার কি কি নিদর্শন বর্ত্তমান আছে? এই প্রসঙ্গে বোয়োন, আঙ্কোর ভাট এবং বরবুদুরের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৫। শৈলেন্দ্র রাজগণ কোথায় রাজত্ব করিতেন? তাঁহাদের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

১। মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে আরবদেশের অবস্থা বর্ণনা কর।

২। মহম্মদ কে ছিলেন? তাঁহার জীবনী এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। খলিফা কাহাকে বলে? ইসলাম-ধর্ম্মের প্রথম চারিজন খলিফা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। কারবালায় যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। হারুণ-অল্-রশীদ কে ছিলেন? তাঁহার সময়ে বাগদাদের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা বর্ণনা কর।

৬। আরব সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকেন্দ্র এবং আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৭। স্পেনদেশের আরব-সভ্যতার একটি বিবরণ লিখ। এখানকার স্থাপত্য-শিল্পের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি বিখ্যাত?

৮। বিশ্ব-সভ্যতায় আরবদের অবদান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ।

৯। কয়েকজন আরব পণ্ডিতের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

১। শার্লেমেন কে ছিলেন? তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। শার্লেমেনের সাম্রাজ্য বিস্তার সম্বন্ধে কি জান? বর্ত্তমান ইউরোপের কোন্ কোন্ স্থলে ইহা প্রসারিত ছিল?

৩। রোলাণ্ডের গীতিকাব্যে কি বর্ণিত হইয়াছে লিখ।

৪। শার্লেমেনের ধর্মানুরাগ ও অভিষেকের কাহিনী বর্ণনা কর।

৫। শার্লেমেনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

সপ্তম অধ্যায় ঃ

১। মধ্যযুগে সামন্তপ্রথা কিরূপে বিকাশ লাভ করিল, তাহা বর্ণনা কর।

২। মধ্যযুগের 'নাইট' হওয়ার প্রণালী কিরূপ ছিল? তাহাদের আদর্শ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। সামন্তগণের খামার-বাটিকা ও দুর্গের একটি বিবরণ দাও।

৪। মধ্যযুগের কৃষকগণের অবস্থা ও জীবনযাত্রা প্রণালী বর্ণনা কর।

৫। মধ্যযুগের সহর ও সহরবাসিগণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৬। সেকালের পুরোহিতগণের জীবনযাত্রা-প্রণালী বর্ণনা কর।

৭। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয় কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল? উহার শিক্ষার্থিগণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৮। মধ্যযুগের সভ্যতা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

৯। ধর্মযুদ্ধের কারণ কি? ইহাতে কে কে যোগদান করিয়াছিলেন এবং ইহাতে কি ফল হইয়াছিল?

অষ্টম অধ্যায় ঃ

১। তুর্কীদের স্বদেশ ছিল কোথায়? তাহারা কোথায় কোথায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল? এই প্রসঙ্গে বর্হির্ভারতের তুর্কীদের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। দাস রাজবংশ সম্বন্ধে একটি ধারাবাহি কবিবরণ দাও। এই বংশকে দাস রাজবংশ কেন বলা হয়?

৩। খিলজী রাজবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের চরিত্র এবং কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৫। ফিরুজশাহ্ তুঘলকের সময় হইতে বাবরের ভারতবর্ষ আক্রমণকাল পর্যান্ত একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ লিখ।

৬। সুলতানীযুগের সভ্যতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ।

৭। সুলতানী যুগে ভারতীয় সমাজের অবস্থা বর্ণনা কর। এই প্রসঙ্গে বিদেশী পর্য্যটকগণ এই দেশে যাহা দেখিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

নবম অধ্যায় ঃ

১। ময়নামতী গীতিকা সম্বন্ধে কি জান লিখ।

২। পাল রাজবংশের স্থাপয়িতা কে ছিলেন? এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ সম্বন্ধে কি জান লিখ।

৪। সেন রাজবংশ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে বাংলাদেশে যেরূপ সভ্যতা ছিল তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

৬। মুসলমান যুগের পূর্ব্বেকার বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের একটি চিত্র বর্ণনা কর।

৭। আকবরের পূর্ব্বে যে দুইটি বিখ্যাত স্বাধীন সুলতান বংশ বাংলায় রাজত্ব করেন, তাহার একটি ধারাবাহিক বিবরণ লিখ।

৮। মুসলমান যুগের হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

দশম অধ্যায় ঃ

১। মঙ্গোল কাহারা? তাহাদের জীবন-যাত্রা প্রণালী বর্ণনা কর।

২। চিঙ্গিজ খান কে? তাঁহার দিগ্বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা কর।

৩। কাহার নির্দ্দেশে চিঙ্গিজ খানের দিগ্বিজয় ও শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইত?

৪। বাটু খান কে ছিলেন ? সে যুগের কখন প্রথম কামান ও গোলা-বারুদ ব্যবহার হয় ?

৫। হলাগুর বাগদাদ অভিযান বর্ণনা কর। কুবলাই খান কে ছিলেন ? তাঁহার রাজত্বের সময় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দাও। কুব্লাই খানের কোন্ ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল ?

৬। মার্কোপোলো কে ছিলেন ? সংক্ষিপ্তভাবে তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।

একাদশ অধ্যায় ঃ

১। অটোম্যান তুর্কীদের স্বদেশ কোথায় ছিল ? তাহাদিগকে অটোম্যান তুর্কী কেন বলা হয় ?

২। স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অটোম্যান তুর্কীরা কোথায় গেল এবং কিরূপে নূতন বাসভূমি লাভ করিল ?

৩। জানিসেরিস বাহিনী কিরূপে গঠিত হয় লিখ।

৪। অটোম্যান তুর্কী কর্ত্তৃক কন্‌ষ্টান্‌টিনোপল অধিকার বর্ণনা কর।

৫। অটোম্যান তুর্কীদের সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।